৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা

বৈশাখ, ১৩৩৫ সাল

সম্পাদক

শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ

কল্লোল পাবলিশিং হাউস,
১০।২, পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা

বিষয়-সূচী

বৈশাখ, ১৩৩৫ সাল

	বিষয়		লেখক		পৃষ্ঠা
১।	নূতন (কবিতা)		শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	..	১
২।	আলো ও আলেয়া (গল্প)		শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য	.	৩
৩।	হারানো সুর (গল্প)		শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	.	১৩
৪।	অপরূপ (উপন্যাস)		শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী	..	২৪
৫।	আরণ্যক (কবিতা)		শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়	..	২৮
৬।	নীড় (গল্প)		শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র	.	৩৩
৭।	যদি কোন দিন (কবিতা)		শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	...	৪২
৮।	যাদুঘর (উপন্যাস)		শ্রীনরেন্দ্র দেব	...	৪৩
৯।	অস্ফুট স্মৃতির সুর (কবিতা)		শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী	..	৫০
১০।	ছায়াপথ (গল্প)	...	শ্রীপান্নালাল অধিকারী	...	৫১
১১।	ডাক-পিওন (বড় গল্প)	..	শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	..	৫৪
১২।	আমি কেন নীরব (প্রবন্ধ)	..	শ্রীপ্রমথ চৌধুরী	...	৫৭
১৩।	কাকজ্যোৎস্না (গল্প)		শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	..	৬১
১৪।	ছায়া (কবিতা)	.	শ্রীবুদ্ধদেব বসু	...	৭১
১৫।	দেবদাস-এর জন্মেতিহাস	.	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	...	৭৩
১৬।	দীপক (উপন্যাস)	..	শ্রীদীনেশরঞ্জন দাশ	...	৭৬
১৭।	ডাকঘর	..			৮১

———

স্থাপিত ১৩০৮ সন

কারখানা ঃ—স্বামীবাগ রোড, ঢাকা হেড আফিস ঃ—পাটুয়াটুলি, ঢাকা

কলিকাতা হেড আপিস ঃ —৫২।১ বিডন ষ্ট্রীট

কলিকাতা ব্রাঞ্চ ঃ—১৩৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট, ২২ হ্যারিশন রোড, ৭১।১ রসা রোড, ভবানীপুর

অন্যান্য শাখা—

ময়মনসিংহ মান্দ্রাজ চট্টগ্রাম চাঁদপুর লক্ষ্ণৌ জলপাইগুড়ি বগুড়া শ্রীহট্ট সিরাজগঞ্জ রাজসাহী
রঙ্গপুর কাশী এলাহাবাদ মেদিনীপুর গৌহাটী পাটনা বহরমপুর নারায়ণগঞ্জ
মাদারিপুর ভাগলপুর কানপুর রেঙ্গুন গোরক্ষপুর নেত্রকোণা

ভারতবর্ষ মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ অকৃত্রিম সুলভ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

দশন সংস্কার চূর্ণ—৵০ কৌটা,
এই চূর্ণ ব্যবহার করিলে দন্তরোগ ও নানাবিধ মুখ-রোগ প্রশমিত হইবে।

বৃহৎ খদির বটিকা—৵০ কৌটা—
পানের সহিত ২।৩ বার করিয়া সেবন করিলে দন্ত সুদৃঢ় হইবে, দন্তের সকল প্রকার রোগ নষ্ট করিবে। মুখে সুগন্ধ বাহির হইবে।

আয়ুর্ব্বেদী চিকিৎসা সম্বলিত ক্যাটালগ, বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার গবর্ণর বাহাদুরের অভিমত এবং দেশবন্ধু দাশ প্রভৃতি বহু গণ্য মান্য মহোদয়গণের বিশেষ অভিমত ও প্রশংসাপত্রাদি এবং অনেক জ্ঞাতব্য বিষয়াদি সন্নিবিষ্ট পুস্তিকা পত্র লিখিলে বিনামূল্যে পাঠান হয়।

টেলি ঃ—শক্তি, ঢাকা

প্রোপ্রাইটার—**শ্রীমথুরামোহন মুখোপাধ্যায় চক্রবর্ত্তী** বি, এ, (রিসিভার)

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু
শিল্পী—শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

ষষ্ঠ বর্ষ
বৈশাখ, ১৩৩৫

নূতন

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমরা খেলা খেলেছিলেম,
আমরাও গান গেয়েছি ;
আমরাও পাল মেলেছিলেম,
আমরা তরী বেয়েছি।

হারায় নি তা' হারায় নি,
বৈতরণী পারায় নি,

নবীন আঁখির চপল আলোয়
সে কাল ফিরে পেয়েছি

দূর রজনীর স্বপন লাগে
আজ নূতনের হাসিতে।
দূর ফাগুনের বেদন জাগে
আজ ফাগুনের বাঁশিতে।

হায় রে সেকাল, হায় রে,
কখন্ চলে যায় রে

আজ এ কালের মরীচিকায়
নতুন মায়ায় ভাসিতে॥

যে মহাকাল দিন ফুরালে
আমার কুসুম ঝরালো
সেই তোমারি তরুণ ভালে
ফুলের মালা পরালো।

কইলো শেষের কথা সে,
কাঁদিয়ে গেলো হতাশে,

তোমার মাঝে নতুন সাজে
শূন্য আবার ভরালো॥

আনলে ডেকে পথিক মোরে
তোমার প্রেমের আগুনে।
শুক্‌নো ঝোরা দিলো ভ'রে
এক পসলায় শাওনে।

সন্ধ্যা মেঘের কোণাতে
রক্তরাগের সোনাতে

শেষ নিমেষের বোঝাই দিয়ে
ভাসিয়ে দিলে ভাগুনে॥

আলো ও আলেয়া

শ্রীভবানী ভট্টাচার্য্য

নারী-সমিতির অনুষ্ঠিত অভিনয়ে ছোট একটি ভূমিকায় দীপালিকে দেখিয়া সত্যেন পরম বিস্ময়ে একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। পূর্ব্ব হইতে পরস্পরের পরিচয় ছিল, কিন্তু সে পরিচয়ে যে কতখানি ফাঁক রহিয়া গেছে, সহসা এক রাত্রির অভিনয়-দর্শনে তাহা তার মনে স্বচ্ছ হইয়া উঠিতে বাকী রহিল না। অতি অকিঞ্চিৎকর ভূমিকা, তাহাতে চিত্তাকর্ষক কিছু থাকিতে পারে এ কথা কেই বা পূর্ব্বে জানিত। কয়েকটি কথা, ছোট দুটি গান। দীপালির মুখে কথাগুলি শুধু ভাষায় ব্যক্ত হইল তা নয়, সে মুখের রেখায় রেখায় সুস্পষ্ট চিত্রিত হইয়া গেল। ঈষৎ অঙ্গভঙ্গী, সে অতি আশ্চর্য্য প্রাণময়; যেন কথা কহিতে থাকে। আর গানগুলি,—তেমন সুরের লীলা সত্যেনও পূর্ব্বে শুনিয়াছে বলিয়া ভাবিতে পারিল না। সব মিলিয়া ভূমিকাটি পরিপূর্ণ শিল্পসৃষ্টি; আর সকলের অভিনয় তার কাছে ম্লান হইয়া গেল।

অভিনয়ান্তে দর্শকরা কতরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে ফিরিয়া চলিলেন, শুধু সত্যেনের ভাবাবিষ্ট, চিন্তান্বিত ভাব রহিয়াই গেল। বাড়ী আসিয়া বাহিরের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া সে কত কি ভাবিতে লাগিল।

খানিক পরে পায়ের শব্দ শুনা গেল, একটি মেয়ে পিছন হইতে ডাকিয়া বলিল, ফিরে এসে চুপচাপ বসে আছ, কেমন লাগল আমাদের বলতে নেই বুঝি?

সত্যেন ফিরিয়া চাহিল। অন্যমনস্ক ভাবে কি বলিল ঠিক বোঝা গেল না।

মেয়েটি হাসিয়া উঠিল। কহিল, বা রে, কি ক'রে বলবে, আমরা তো এই এখনি আসছি। দীপালিকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়ে এলুম কিনা।

মুহূর্ত্তে সজাগ হইয়া উঠিয়া সত্যেন বলিল, কোন্ দীপালি?

—দীপালিকে চেন না?—কতবার তো দেখেছ। আজ কি সুন্দর করল নিজের পার্ট, সবার চেয়ে ভাল। তোমার ভাল লাগে নি?

—মন্দ কি! তবে মায়ার মতন কি আর—

—মায়া?—কি বিশ্রী! মেয়েদের পুরুষের পার্টে এত খারাপ দেখায়, ছেলেদের যেমন মেয়ের পার্টে। দেখলে এত হাসি পায়! ... যাও, দুষ্টুমি হচ্ছে বুঝি? আমি ঠিক জানি দীপালিকেই তোমার সব্‌চে ভাল লেগেছে।

সত্যেন তাড়াতাড়ি কথাটা অন্য পথে ফিরাইয়া দিল।—এবার পুজোর ছুটিতে কোথায় যাওয়া যায় বল্ তো রেবা? কলেজ বন্ধ হতে দেরী নেই, আগ্রা গেলে হয় না? আমার ক'জন ছাত্রকেও সঙ্গে নেব ভাব্‌ছি।

বিকালের গানের সভাটি সেদিনও বসিয়াছিল। অনেকগুলি তরুণ-তরুণী ইতস্তত ঘুরিতে ফিরিতেছিল। বাড়ী দীপালিদের। অনেকেই গাহিতেছিল, তবে দীপালির গান শুনিতেই সকলে যেন একান্ত উৎসুক। নানা জনের নানা ফরমায়েসি গান গাহিয়া অবশেষে যখন ক্লান্তিভরে দ্রুতনিশ্বাসে সেতারটা একপাশে নামাইয়া রাখিয়া সে থামিয়া গেল, চারিদিকে প্রশংসার মৃদু গুঞ্জন উঠিল। শ্রোতাদের একজন কহিলেন, আপনার সব গানের চেয়ে কিন্তু সেদিন-কার সেই 'প্রেম' গানটা আমার ভাল লাগে, সে যা চমৎকার, জীবনে ভুলব না!

আর একজন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, আমারও ঠিক ওই কথা। সেটা গান না একবার দয়া করে, যদি বড় বেশী ক্লান্ত না হয়ে থাকেন—।

—আমার যে গলা ধ'রে এল, সেই তখন থেকে গাইছি।

একটি মেয়ে কলকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, সে গানটাও কিছুতেই সকলের কাছে গাইতে চায় না, দশবার অন্তত না বললে হবে না। আমরা যদি ওর মতন জানতুম, বলতেও হত না একবার।

গান চলিতে থাকে। গানের শেষে কোনো সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের নব প্রকাশিত উপন্যাসের সমালোচনা চলিল; অনেকেই বিজ্ঞভাবে আপন মত বলিলেন, কোথায় কোথায় আর্টের দোষ হইয়াছে অবলীলাক্রমে তা জানাইয়া দিলেন। তারপর সে দিনকার রেসের কথা, রেডিও, ফিল্‌ম্‌, খেলা—এমনি নানা কথা চলিতে চলিতে একজন বলিলেন, এবার যা বন্যা দেখে এলুম, কি ভয়ানক, না দেখলে বোঝা যায় না।

দীপালি বলিল, কাগজে আপনি এ সম্বন্ধে খুব লিখছেন, না?

এ কথায় অনেকগুলি চোখের দৃষ্টি সেই সাহেবি বেশে সজ্জিত মানুষটির উপর নিবদ্ধ হইল। দু'হাতে কলারটা একটু টানিয়া সোজা করিয়া দিতে দিতে মৃদু মধুর হাসিয়া তিনি বলিলেন, হাঁ, আপনি পড়েছেন? অনেকগুলো চমৎকার ফটোও তুলেছি, অনেক কষ্টে। না খেতে পেয়ে লোকগুলো যা হয়েছে, সহজে কি চলতে পারে? অনেক কষ্টে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে ছবি তোলা গেল। আপনাদের দেখাবো।

দীপালির এক বান্ধবী প্রশ্ন করিল, শুনলুম সত্যেন বাবু তাঁর ছাত্রদের নিয়ে অনেক কাজ করে' এসেছেন, গ্রামে গ্রামে ঘুরে কত লোককে বাঁচিয়েছেন—

—সত্যেন? ওঃ, অমন অনেক কথাই তো শোনা যায়; একটা টাকা চাঁদা উঠোতে চেষ্টা করেন নি, শুধু ছেলেদের নিয়ে রাস্তায় দল বেঁধে গান গেয়ে ভিক্ষে করে বেড়ানো ছাড়া। এতে কি বিশ্বাস হয়, আসলে কিছু কাজ করেছেন?

একটু থামিয়া কহিলেন, জানেন, একটা বোকা গোছের মাড়োয়ারীকে বেশ করে' বুঝিয়ে পাঁচশো টাকা আদায় করে' ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি, সেজন্য তিনি ধন্যবাদ দিয়ে চিঠিও লিখেছেন। বলিয়া তিনি পরম আত্মপ্রসাদে মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

একজন উঠিয়া দাঁড়াইয়া দীপালির প্রতি চাহিয়া সাগ্রহে কহিলেন, আর না, এবার খানিকক্ষণ টেনিস খেলা যাক্। আজ কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে এক সেট্ সিংগ্‌ল্‌স্ খেলব।

দীপালি বলিল, আজ আমার খেলতে তেমন ইচ্ছে করছে না, আপনারা সবাই খেলুন না, আমি দেখি।

—একেবারে খেলবেন না? অন্তত এক সেট্—

পরম ক্লান্তভাবে দীপালি একটু হাসিল; বলিল, আচ্ছা চলুন, খেলি।

খেলা জমিয়া উঠিয়াছিল, উৎসাহের সীমা নাই, সহসা একজনের অপ্রত্যাশিত আগমনে সকলেই থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। বেশে তাঁর লেশমাত্র বাহুল্য নাই, মোটা খদ্দরের চাদর নিতান্তই সাধারণ ভাবে পরিহিত, পা দুইটি খালি—খানিকটা ধুলা লাগিয়া রহিয়াছে। মুখের চেহারায় অসামান্য কিছুই দেখা যায় না, শুধু চোখ দুটির প্রতি দৃষ্টি পড়িলে সে দৃষ্টি ফিরাইয়া লওয়া যেন বড় কঠিন।

এবারও পূর্ব্বের সেই মেয়েটি প্রথমে কথা কহিল। বলিল, সত্যেন বাবু? কতদিন যে আমরা আপনাকে দেখি নি।

সত্যেন হাসিয়া বলিল, দেখতে চান্ নি কি না, তাই। আমি কিন্তু এর মধ্যে আপনাদের একবার দেখে ফেলেছি।

—কোথায়, ষ্টেজে তো? আপনি আসবেন এ আমরা একেবারেই আশা করি নি। যা ব্যস্ত থাকেন।

খেলা চলিল, কথার গতি কিন্তু যেন রুদ্ধ হইয়া পড়িল। সত্যেন খেলিল না, দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। খানিক পরে দীপালি সহসা খেলা ছাড়িয়া তার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মুখখানি স্বেদসিক্ত, মাথার কয়েকটি চুল ভিজিয়া গালের উপর লাগিয়া রহিয়াছে। মুখ নীচু করিয়া অত্যন্ত নিম্নস্বরে সত্যেনের সহিত কথা কহিতে লাগিল। প্রশ্ন করিল, সেদিন আপনি কোথায় বসেছিলেন, আমি তো আপনাকে দেখি নি? আপনার কথা কিন্তু মনে পড়ছিল, ভাবলুম হয় তো এখনো বন্যার কাজ থেকে ফেরেন নি।

এত বড় বিস্ময়কর সংবাদ সকলকেই যেন স্তম্ভিত করিয়া

দিল। দুইমাস মাত্র গত হইয়াছে, ইতিমধ্যে সত্যেন ও দীপালির মনোভাব কেমন করিয়া কোন্ পথ ধরিয়া পরস্পরের একান্ত সন্নিকটে আসিয়া পড়িল, ইহা লইয়া অনেকেই নানা কথা কহিতে লাগিলেন। সত্যেনের অনুরাগী এক বন্ধু কহিলেন, আমি চিরকাল বলে আসছি, সত্যেনের মধ্যে এক মহা তেজস্বী personality আছে, যার জোরে ও এত সহজে মানুষকে মুগ্ধ করতে পারে। মেয়েরা ওকে ভাল না বেসে থাকতেই পারে না, বিশেষ ক'রে দীপালির মত মেয়ে—যার মধ্যে গভীরতা আছে।

ক্রমে দেখা গেল, সংবাদে ভুল নাই। আয়োজন চলিল, একদিন দুইজনের বিবাহও হইয়া গেল। দীপালির বন্ধুবর্গ দীর্ঘশ্বাস ফেলিলেন, সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, সকল বিষয়ে অনিন্দ্যসুন্দর এমন মেয়ে সচরাচর দেখা যায় না। বিকালটা কাটিত ভাল, কে জানে সত্যেনের গৃহে তেমন করিয়া যাওয়া চলিবে কিনা। অনেকে আসল মনোভাব লুকাইতে সত্যেনের নানারূপ প্রশংসা করিলেন, সৎসাহস দেখাইয়া প্রকাশ্যেই বলিলেন, সত্যেনের মতন অমন খাপছাড়া মানুষকে লইয়া দীপালি সুখী হইতে পারিবে না।

দিনগুলি বহিয়া চলিল। ক্রমশ বন্ধুরা সত্যেনের গৃহেও নিয়মিত দেখা দিতে লাগিলেন। সত্যেন প্রায়ই বাড়ী থাকিত না, দীপালির সহিতই সকলের কথা চলিত। গানও যে সে দু'একটা না গাহিত এমন নয়, পূর্ব্বের মত নানাবিধ প্রসঙ্গের আলোচনাও হইত। এমনি করিয়া পূর্ব্বেকার জীবনধারার আস্বাদ তার বিবাহিত জীবনেও অপরিবর্ত্তিত রহিয়া গেল।

বিবাহের পূর্ব্বে একদিন সত্যেন তাকে একটা কথা বলিয়াছিল, আমরা ভালোবাসা নিয়ে কখনো খেলা করব না, দীপা। কোথাও এতটুকু মিথ্যা অভিনয় থাকবে না। আমাদের পরস্পরের চাওয়া একদিন যদি শেষ হয়ে যায়, নিজেদের বৃথা সান্ত্বনা দেবো না—মুক্তি দেবো।

এ-কথায় দীপালির দুই চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল; কহিল, ও-কথা তুমি বলছ কেন? আমার যে ভয় হয়—।

—জানো দীপা, জীবনে যা কিছু দুঃখ আসতে পারে, তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকলে সে দুঃখের অর্দ্ধেক জ্বালা চলে যায়। আর এ সাহস না থাকলেই মনে কেবল ভয় আসে। আজ আমরা আমাদের এ ভালোবাসা পরমসত্য বলেই জানি, কিন্তু একদিন যা সত্য, পরের দিন তা মিথ্যা হয়ে যাওয়া—জীবনে এ তো নতুন কথা নয়!

তারপর হাসিয়া বলিল, কিন্তু আমাদের বেলা হয় তো কখনো সে মুক্তির দরকার হবে না, তাতে তোমার দুঃখ নেই তো?

দীপালি এবার শুধু একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া মুখখানি নত করিল।

জীবন তাদের বহিয়া চলিল। দীপালির মনে অতৃপ্তি ছিল না, কিন্তু মাঝে মাঝে সে বেশ অনুভব করিত, সত্যেনের সমস্ত মনপ্রাণ তার কাছে কি যেন প্রত্যাশা করে; সত্যেনের সেই প্রত্যাশার বস্তু তার মধ্যে আছে, এ কথাও মাঝে মাঝে দীপালি বুঝিত। নির্জ্জন মুহূর্ত্তে, রাত্রির অন্ধকারে, সহসা কোনো নিবিড় আনন্দের ক্ষণে বিদ্যুতের মত তার মনে ঝলসিয়া যাইত,—কি যেন তার অন্তরে আছে, কিন্তু বাহিরে প্রকাশের পথ না পাওয়ায় নিদ্রামগ্ন হইয়া গেছে। নিজের ভিতর একটা ক্রন্দন সে শুনিতে পাইত, কে যেন সকাতরে কত কি চাহিতেছে। নিজেকে সহজবোধের স্বচ্ছ আলোকে দেখিতে না পারিয়া, আপন আকাঙ্ক্ষারাশির সঠিক গঠন বুঝিবার শক্তি না থাকায় সে আরো সংশয়াকুল হইয়া উঠিত!

একদিন আকস্মিক ভাবাবেগে সে নিজের এই মনোভাব সত্যেনকে নিঃশেষে জানাইয়া দিয়া কহিল, আমার মন তুমি আমার চেয়ে অনেক ভাল বোঝ, আমায় বলে দাও কেন এমন হয়—।

সত্যেনের মুখ গভীর আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দীপালির মধ্যে ইহাই সে চাহিয়াছিল, নিজেকে জানিবার এই প্রয়াস।

যে আবেষ্টনীতে দীপালির কুড়ি বছরের জীবন কাটিয়া গেছে, তাতে তার প্রকৃতির অগভীর দিক্‌টাই শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে।—বাহিরের ঘটনা, অতি সাধারণ ভাবনা, ক্ষণিক অনুভূতির অসার তৃপ্তি। ইহার মধ্যে তার গভীরতর সত্তা ক্ষীণ দীপশিখার মতই জ্বলিত, সে আলো চারিদিকের

অন্ধকার ছিন্ন করিয়া বাহির হইয়া আসার পথ পাইত না। এই মানসিক বন্দীত্ব কাটাইয়া দীপালি উচ্চ জীবনের পথে ছুটিয়া চলুক, শিক্ষা, সংস্কার, চিন্তা—এ সকলের সর্ব্ববিধ বন্ধন কাটাইয়া সে উপরে উঠুক, ইহাই ছিল সত্যেনের একান্ত কাম্য। নারী-সমিতির অভিনয়ে যেদিন সে তাকে নূতন করিয়া দেখিল, নূতন ভাবে চিনিল, তার সমস্ত প্রাণ ছাপাইয়া অজ্ঞাতপূর্ব্ব এক আবেগ বন্যাবেগে ছুটিয়া আসিয়া তাকে জানাইয়া দিল, ওর মধ্যে প্রাণ আছে, শিল্পীপ্রাণ। শুধু তার সুপরিণতির অভাব। অনুভূতির যে নিবিড়তা, চিন্তাশক্তির যে তীক্ষ্ণতা শিল্পীমনের একান্ত প্রয়োজন, তা তার আসিতে পারিতেছে না, শুধু তার চারিদিকের সমাজ-জীবনের অত্যাচারে। যেন একটি শুভ্র পুষ্প, আলো-বাতাস না পাইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। বিজন অরণ্যপথে একটি মানুষ সহসা ঠিক তারই মত আর একজনের দেখা পাইলে সে যে গাঢ় আনন্দে তার কাছে ছুটিয়া যাইতে চায়, সেই প্রেরণা লইয়াই সত্যেন দীপালির কাছে গিয়া পূর্ব্বেকার বাহ্য পরিচয়ের বন্ধন অন্তরের বস্তু করিয়া লইয়াছিল। আর দেখিয়াছিল, অন্তর্মুখী সাধনায় দীপালির যখন মগ্ন হইবার কথা, তৎকালে তাকে অনেকের এরূপ দাবী মিটাইয়া চলিতে হয়, যাহা অত্যাচারের একেবারে চরম। গান তাকে গাহিতে হয়, সে গান কাহারও প্রাণ পর্য্যন্ত পৌঁছে না, শুধু মুহূর্ত্তের তৃপ্তি অথবা ভাবের ক্ষীণতম উপলব্ধি মাত্র ঘটায়। তাকে খেলিতে হয়, কাহারও আনন্দার্থে নয়, কোনো সুশ্রী মেয়ের সঙ্গলাভে সাধারণ পুরুষের মনে স্বভাবত আত্মগৌরব বোধ ও তার আনুসঙ্গিক যে বিবিধ মনোভাব আসে, তাহা পাইবার জন্যই এতগুলি দৃষ্টি তাকে সকাতরে ডাকিতে থাকে। সকলেই তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশে উৎসুক, সে শ্রদ্ধা তার নারী-হৃদয়ের প্রতি নয়, কতকটা সামাজিক সংস্কার মানিয়া চলিতে এবং বিশেষ করিয়া তাদের ভিতর অত্যন্ত গোপনে যে আদিম মানব-প্রকৃতি তার অদম্য ক্ষুধা ও তৃপ্তিহীন স্বার্থপরতা লইয়া বাঁচিয়া আছে, তাকে বিচিত্র সাজসজ্জায় ঢাকিয়া রাখিতেই এ সকল বাহিরের বাহুল্য।

দীপালির প্রকৃতির অগভীর দিকটা ইহাতে তৃপ্তি পাইত, কিন্তু তার সত্যদ্রষ্টা শিল্পীহৃদয় নিজের পাশাপাশি উপবিষ্ট এই হীনতার আসল রূপ দেখিয়া নিবিড় লজ্জায় হয় তো মরিয়া যাইতেই চাহিত। মানস-জগতে এই যে দ্বন্দ্ব চলিয়াছিল, তার ছায়া তাহার মুখে পড়িত; ক্ষণে ক্ষণে চোখদুটি তার সজল হইয়া উঠিত, অকারণে তাকে যেন বিষাদাচ্ছন্ন দেখাইত, যদিও নিজের এ বিষাদের অর্থ সে স্পষ্টত কিছুই বুঝিত না। বন্ধু-বান্ধবীরা ভাবিতেন, সত্যেনের জন্য এমন হইতেছে, ভাবিয়া আরো বেশী করিয়া তাকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া থাকিতেন। অর্থহীন কাজের ভিড়ে দীপালি আর কিছু চিন্তা করিয়া তলাইয়া দেখিবার অবসর পাইত না, জোর করিয়া নিজের সে বিষণ্ণভাব দূর করিয়া সাধারণ জীবনের উৎসবময়, বর্ণবহুল স্রোতে নিজেকে ডুবাইয়া দিত।

যখন সে অকস্মাৎ সত্যেনকে তার মনের আসল পরিচয় দিয়া ফেলিল, দীপ্তমুখে সত্যেন কহিল, আমি জানতুম দীপালি, তোমার মনে একটা দ্বন্দ্বের ভাব চলেছে; আর ঠিক এই দিনটির জন্যেই চেয়ে ছিলুম, যখন তুমি নিজে থেকে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে এ দ্বন্দ্বে সহায় হতে বলবে।

দীপালি সাগ্রহে কহিল, তুমি বুঝি আমায় নূতন ক'রে গড়ে তুলবে?

মৃদু হাসিয়া সত্যেন বলিল, না, সে হয় না। শুধু তোমার মধ্যে যা-কিছু আছে তার পরিপূর্ণ বিকাশ আমি দেখব। নিজেকে তোমায় চিনতে হবে, তাহলেই বুঝবে তোমার জীবনের কি কাজ। অতি সাধারণ দশ জনের মতন জীবনটা কাটিয়ে দেওয়া তো তোমার চলবে না।

ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া দীপালি কহিল, আমি যে আর পারি নে, চারিদিক থেকে সবাই আমায় টানছে, বাঁচতে দেবে না—।

পরমস্নেহে সত্যেন তাহাকে কাছে টানিয়া লইল। কহিল, ভাবনা কি, তোমার যে আমি আছি।

—তুমি কেন আমায় বলে দিচ্ছ না আমায় কি করতে হবে?

—না, সে আমি বলবো না দীপা। তুমি তো আর আমার হাতের পুতুল নও যে যেমন ইচ্ছা গড়ে নেব; নিজের পথ নিজেই বেছে নিতে হবে, আমি শুধু একটুখানি

আলো দিতে পারি; যে সত্যকারের মানুষ হতে চায়, তার ভাগ্যে কষ্ট লেখা থাকে, আমি তোমার সে কষ্টের ভাগ নেওয়া ছাড়া আর কিছু তো করতে পারি না।

অত্যন্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে সত্যেন বলিয়া চলিল, কিন্তু আমার কষ্টের ভাগ তুমি তো নিতে চাও নি দীপা,—আমার পথের সহায় হতে। জানো তো, আমি যেখানে যেগানে কাজে ডুবে আছি, সমাজের সে সব স্তরে মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছে। তবু আমি এখনো বেঁচে আছি, আর—।

মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া দৃপ্তস্বরে কহিল, আর দিনদিন এগিয়ে চলেছি।

দীপালি মুখ তুলিয়া চাহিল। দুই চোখ তার বিস্ময়ে ভরিয়া গেছে দেখিয়া সত্যেনের মুখের হাসি সহসা গাঢ় বিষাদে ভরিয়া গেল। কহিল, কথাগুলো নতুন লাগছে?

—তুমি তো এমন করে আমার কাছে কখনো বল নি। তোমাকে যে আমি সাধারণের একেবারে বাইরে বলেই জানি।

—আমিও যে মানুষ, দীপা; একলা চলতে কষ্ট হয়।

চুপচাপ। বাহিরে তখন ঝড় উঠিয়াছিল; লম্বা গাছ গুলার মাথা দুলিতেছে—যেন ভাঙিয়া পড়িবে। দিনের আলো ধীরে নিভিয়া আসিতেছে, স্পষ্ট করিয়া কিছুই দেখা যায় না।

সত্যেনের কাঁধে হাত রাখিয়া দীপালি শান্তস্বরে কহিল, এতদিন তোমায় বুঝতে পারি নি, কিন্তু এবার থেকে আমায় তোমার পাশে দাঁড়াবার অধিকার দাও!

রেবা ডাকিয়া বলিল, বৌদি, চিঠি।

দীপালি খামখানা লইয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিল। হাতের লেখা অপরিচিত। তারপর খুলিয়া পড়িতে লাগিল।

রেবা কহিল, অত খুশী কেন, কার চিঠি দেখব? বলিয়া পিছন হইতে ঝুঁকিয়া দেখিতে দেখিতে নিজেও হাসিয়া উঠিল।—যাক্, এবার তুমি ভাই, রীতিমত লেখিকা হয়ে পড়লে। সম্পাদকের ভাল লাগবারই কথা, সেটা এত চমৎকার হয়েছে—।

দীপালি কহিল, তোমার দাদাকে এখনো বলি নি ভাই, ভেবেছিলুম ছাপা হয়ে গেলে হঠাৎ দেখালে বেশ মজা হয়।

চিঠিটা আর একবার পড়িয়া দীপালি কি ভাবিয়া সত্যেনের ঘরে গেল। সম্মুখস্থিত খোলা বইখানা অতর্কিতে সরাইয়া লইয়া উচ্ছ্বসিত হাস্যে চিঠিটা সাম্‌নে ফেলিয়া দিল। সত্যেন কৌতুকের স্বরে কহিল, প্রফেসারের সঙ্গে দুষ্টুমি!

চিঠি পড়িতে পড়িতে সত্যেনের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। নিমেষের জন্য। পরক্ষণে মুখের সে দীপ্তি নিভিয়া গেল। প্রশ্ন করিল, কোন্ লেখাটা দিয়েছ?

—সেই ছোট গল্পটা, যেটা তোমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল। তোমায় না বলে পাঠিয়েছি, রাগ করছ না তো? ভেবেছিলুম ছাপা হলে হঠাৎ দেখিয়ে তোমাকে আশ্চর্য্য করে দেব। বলিয়া সে সত্যেনের পাশে দাঁড়াইয়া তার কাঁধে মাথা রাখিয়া গাঢ়স্বরে কহিল, বল, রাগ কর নি?

সত্যেন উত্তর করিল না। মুখের উপর মেঘের মত ছায়া ফেলিতে ফেলিতে চিন্তারাশি মনোমধ্যে ছুটিয়া চলিয়াছে, স্পষ্টই বুঝা যায়। দীপালির শঙ্কাকুল চক্ষু দুইটি নিজের দিকে নিবদ্ধ দেখিয়া ধীরে হাত বাড়াইয়া সে তার বাহুদ্বয় বক্ষে চাপিয়া ধরিল। তারপর অত্যন্ত দৃঢ়স্বরে কহিল, লেখাটা ফেরত আনলে হয় না?

দীপালির মুখ মলিন হইয়া গেল। মাথা নাড়িয়া জানাইল, ফেরত আনাইবে।

—আমি কি অন্যায় কথা বলছি বলে তোমার মনে হচ্ছে দীপা? খেয়াল মতন যা-ইচ্ছা তাই?

দীপালি এ প্রশ্নে ফিরিয়া তার মুখের প্রতি চাহিল। সে মুখের বর্ণে ঔজ্জ্বল্য নাই, কিন্তু কেমন যেন মাধুর্য্য আছে। চুলগুলি অবিন্যস্ত, কয়েক গোছা চক্ষু পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। সুগঠিত ললাটে অত্যন্ত ক্ষীণ দু'একটি রেখা পড়িয়াছে, সহজে তা' চোখে পড়ে না। মুখের সে ছবি দেখিয়া বার বার দেখিতে ইচ্ছা হয়, কিছুতেই কিন্তু বোঝা যায় না, তার মধ্যে যে বস্তু একান্ত স্পষ্ট, তাহা মানুষটির হৃদয়ের প্রতিচ্ছবি—না তার সুতীব্র প্রজ্ঞার ঈষৎ ইঙ্গিত।

দুজনের কেহই কথা কহিল না, নীরবে আপন আপন

ভাবনায় মগ্ন হইয়া রহিল। অবশেষে সত্যেন বলিল, তুমি তো জান,—তোমার লেখা আমার কত ভাল লাগে, কিন্তু যখন দেখি তুমি নিজেকেই নিজে অপমান করছ, আমার খুব দুঃখ হয়।

কথাগুলির অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতায় দীপালির মনের অন্ধকার খানিকটা কাটিয়া গেল, কথার অর্থ কিন্তু সে সুস্পষ্ট বুঝিল না।

বলিতে বলিতে সত্যেনের কণ্ঠস্বর দীপ্ত হইয়া উঠিল।—নিজের দিকে চেয়ে ভেবে দেখলেই বুঝবে কাগজে তুমি লেখা পাঠিয়েছ মামুলি প্রশংসা পেয়ে, self-admiration-এর ভাব মনে আনতে। জানি, এ ভাব খুব স্বাভাবিক। কিন্তু নিজেকে এত সাধারণ সামান্য করে তুলতে তোমার কষ্ট হয় না, দীপা? এতে কি হবে জান? খুব লিখবে, প্রশংসা পাবে, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত;—এগিয়ে চলতে, সৃষ্টির আনন্দ পেতে পারবে না।

কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া পুনশ্চ কহিল, লেখার পর লেখা ছাপানো—এর একটা মোহ আছে। আর্টিষ্টের জীবনে এই মোহ সবচেয়ে বড় বিপদ। তোমার মধ্যে সৃষ্টি করবার শক্তি আছে,—তুমি দেখতে পাও না, আমি পাই। কিন্তু নিজের উঁচু আদর্শের পথ থেকে একবার নেমে এলে, ওঠা কঠিন হবে।

দীপালি বলিল, আমি যে নিজে থেকে কিছু বুঝতে পারি নে, তুমি যখন বল আমার প্রাণটা যেন জ্বলে ওঠে, ভুল ভেঙ্গে যায়। কিন্তু তারপর আবার সব ভুলে যাই।

নিবিড় দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া সত্যেন অন্যমনে ভাবিতে লাগিল; সহসা চোখে তার আগুন জ্বলিয়া উঠিয়া মুহূর্ত্ত পরে নিভিয়া গেল। কহিল, সেকালের অসভ্য জাতের মেয়ের মতন প্রাণে প্রাণে সমস্ত রক্তের শিরায় কোনো জিনিষ অনুভব করতে পারো না দীপা? তা যদি পারো, আর কখনো ভুল হবে না। আজকালকার মানুষ তার মনুষ্যত্ব দূর করবার জন্যে যে সব মৃত্যুবাণ তৈরী করে নিয়েছে, অর্থাৎ তার শিক্ষা, সমাজ, সভ্যতা ভব্যতার চলতি আদর্শ—তার থেকে নিজেকে বাঁচাতে হলে বাঁচবার দুর্দ্দান্ত সাহস নিজের মধ্যে জাগাতে হয়। তা এলে চারদিকের বাধা আর তোমায় বেঁধে রাখতে পারবে না,—প্রাণ যার আছে, সে এগিয়ে চলবেই।

দীপালি কোন উত্তর করিল না। শুধু আরো একটু কাছে আসিয়া আনতদেহে সত্যেনের বুকের উপর মাথা রাখিয়া নীরব রহিল। এবার মুখখানি তার যেন কিসের আভায় ঝলমল করিতেছিল।

কয়েক মাস কাটিয়া গেল। মানব-মনের অত্যন্ত গোপন গতিবিধি সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছুই ভাবা চলে না, কিন্তু জীবনের পায়ে পায়ে সর্ব্ববিধ মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া চলার আগ্রহে সত্যেন বুঝিয়াছিল, দীপালি আবার দুঃসহ আকর্ষণে পিছাইয়া চলিয়াছে; তার পূর্ব্বের জীবন-প্রবাহ তাকে পুনর্ব্বার ডাক দিয়াছে। ভালোবাসার আলোয় একান্ত দুর্ব্বোধ্য মানুষকেও স্পষ্ট দেখা যায়, তাই সত্যেন দীপালির মনোজগতের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রন্ধ্রটিও বুঝিয়া লইয়াছিল। এতদিন তাদের মন এক পথে চলিতে ছিল; দীপালির অন্তরের যে গঠনটি তার আকাঙ্ক্ষার বস্তু, সে প্রত্যাশা তার পূর্ণপ্রায়, নারীত্বের শুভ্রসুন্দর সত্য রূপ তার মধ্যে বিকাশোন্মুখ,—ভাবিয়া তার তৃপ্তির আর অন্ত ছিল না। এই কয় মাসে তাদের মানসলোকে কত রূপ হাওয়াই না বহিয়া গেল! দীপালিকে কাজের সঙ্গিনী পাইয়া তার কাজের আনন্দ শত গুণ বাড়িয়া উঠিয়াছিল। দুর্ভিক্ষগ্রস্ত নর-নারীর সেবায় যে তাদের এক মাস কাটিয়া গেল, সে সময়টার স্মৃতি কত মধুর! দীপালিকে সে গ্রামের সবাই চিনিয়া লইয়াছিল, ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। এক দিনের কথা তার বরাবর মনে পড়ে। পথের ধুলায় একটি শিশু অনাহারে শুকাইয়া মরিতেছে। পথ দিয়া চলিতে চলিতে সহসা ঝোপের পাশে পরিত্যক্ত শিশুটিকে দেখিয়া দীপালি মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইয়া রহিল, তারপর কেমন একভাবে বাহু মেলিয়া দ্রুতপদে কাছে ছুটিয়া গিয়া ব্যগ্র আগ্রহে তাহাকে বুকে তুলিয়া লইল। অস্থিসার, শুষ্ককায় শিশুর ধূলিধূসর মুখে সে তার মুখখান সজোরে চাপিয়া রাখিয়া বহুক্ষণ নিশ্চলভাবে প্রতিমার মত

দাঁড়াইয়া রহিল। মুখে তার সগুজাগ্রত মাতৃত্বের প্রখর তৃষ্ণা ধূ ধূ করিতেছে, সমস্ত দেহ যেন বিদ্যুতের স্পর্শে কাঁপিয়া উঠিতেছে, চুলগুলি পিঠের উপর ছড়ানো, আঁচলটা ধূলায় লুটাইয়া গৈরিক রঙের হইয়া গেছে। সে মুখের ছবি দেখিয়া সত্যেন বিহ্বল হইয়া গেল, নীরবে নিমগ্নমনে বহুক্ষণ দুইজনে দাঁড়াইয়া রহিল। সহসা চোখ তুলিয়া সত্যেনের মুগ্ধ দৃষ্টি নিজের প্রতি নিবদ্ধ দেখিয়া গভীর লজ্জায় আরক্ত-মুখে দীপালি যেন আত্মস্থ হইল।

সুরার মত তীব্র আনন্দের মাদকতা সে গ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিবার পরও কিছু দিন তাকে আচ্ছন্ন রাখিয়াছিল। তারপর ক্রমশ বন্ধুবান্ধবদের আবির্ভাব হইল, দীপালিকে পুনশ্চ নিজেদের মধ্যে ফিরিয়া পাইয়া তারা তাঁদের সমাজ-জীবনের সোনার হরিণ নূতন উৎসাহে তার সম্মুখে ছাড়িয়া দিতে লাগিলেন। কোন্ অসতর্ক মুহূর্ত্তে তার প্রাণের সাড়া নীরব হইয়া গেল, থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া অতর্কিতে সে সেই অগভীর জীবনধারায় নিজেকে আবার ভাসাইয়া দিল। পথের প্রান্ত হইতে পিছনে চাহিয়া সত্যেন দেখিল, যে পথে সে আসিয়াছিল, সেই পথেই স্রোতের বেগে ফিরিয়া চলিয়াছে, সব সাধনা মোহের আবর্ত্তে ব্যর্থ হইয়া গেছে। প্রাণশক্তির এই বিচিত্র লীলা, মানসিক জীবনে প্রাণের উপলব্ধির পরই মৃত্যুর এই নির্ম্মম আকর্ষণ—এ সকলই সত্যেন দীপালির মধ্যে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল। কিন্তু তাকে জোর করিয়া ফিরাইতেও সে চাহে নাই। শুধু সহসা একদিন প্রশ্ন করিয়া বসিল, তোমার মধ্যের আর্টিষ্টের খবর কি দীপা? আছে?

দীপালি চমকাইয়া লাল হইয়া উঠিল। চাপাগলায় কহিল, তুমি ভেব না, ও মরবার নয়।

বিদ্রূপহাস্তে সত্যেন বলিল, অনেকে ভূত দেখেছে বলে শোনা যায়, বাইরের ভূতের কথা জানি না, মনের মধ্যে অনেকেই কিন্তু ভূত দেখে,—আর ভাবে সেইটাই আসল!

এ অপ্রত্যাশিত ও একেবারে অচিন্ত্যপূর্ব্ব আঘাতে দীপালির সারা মুখে কে যেন কালি ঢালিয়া দিল। মৌন ব্যথাময় চক্ষু সত্যেনের দিকে নিবদ্ধ করিয়া সে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিল।

ভিতরটা যার ধীরে ধীরে পুড়িয়া ছাই হইতেছে, অন্তরের উত্তাপ তার মুখে একটা আলোর আভা ফেলে; সত্যেনের মুখে সে আভা তার হাসির আবরণের ভিতর দিয়াও বাহির হইয়া পড়িতেছিল, তাই দেখিতে দেখিতে দীপালির চোখের ব্যথিত দৃষ্টি প্রথমে বিস্ময় ও শঙ্কায়, তারপর যেন নিবিড় ক্রন্দনে ভরিয়া উঠিল। সত্যেনের বাহু দুটি ধরিয়া ব্যাকুল স্বরে কহিল, বল, তুমি আজ অমন করছ কেন? কিসের ব্যথা তোমার?

মুহূর্ত্ত মধ্যে সত্যেন নিজেকে সম্বৃত করিয়া লইল। নিজের দুর্ব্বলতা সে গোপন রাখিতে চায়, যতক্ষণ না অন্য একটি মনের স্নেহস্পর্শ একেবারে অনাহুতভাবে সেই দুর্ব্বল স্থানটুকুর উপর নামিয়া আসে। তাড়াতাড়ি দীপালিকে কাছে টানিয়া স্নেহের সুরে কহিল, কই, কোথায় কি! ও কিছু না। বলিয়া অত্যন্ত স্নিগ্ধকণ্ঠে হাসিয়া কথায় ও আদরে তাকে ভুলাইয়া দিল। দীপালির মনে যেন একটু সংশয়ের ছায়া রহিয়া গেল, সে তার ব্যাকুল প্রশ্নটা জোর করিয়াই চাপিয়া রাখিল। সত্যেনের প্রাণের একান্ত কাছে আসিয়াও সে তাকে দেখিতে পাইল না,—মাঝে যবনিকা রহিয়া গেল

ক্ষণকাল পরে দীপালি যখন লঘুমনে ত্বরিতপদে ঘরের কাজে চলিয়া গেল, সেই মুহূর্ত্তেই সত্যেনের মুখের হাসি মিলাইয়া গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গেল ... সে যেন একেবারে একা; সমস্ত সত্তা তার ভারাক্রান্ত, আর যেন চলিতে পারে না; শ্রান্ত স্খলিত চরণে আশ্রয় চায়, হাত ধরিয়া চলিবার জন্য পথের সঙ্গিনী চায়। যে মানুষটির ভিতরটা দেখিতে পাইয়া একান্ত বিশ্বাসে তার দিকে সে হাত বাড়াইয়া দিয়াছিল, সেই মানুষটিরই প্রদত্ত নৈরাশ্যের বিরাট বোঝা আজ যেন তার সুদৃঢ় মেরুদণ্ডটা একেবারে ভাঙ্গিয়া দিতেছে, অসীম সাধনায় লব্ধ মনের নির্ব্বিকার ভঙ্গিমাটির ভিতর আজ যে শূন্যতার গহ্বর দেখা যায়, তাকে পূর্ণ করিতে যেন তার সমস্ত মনের উপর দিয়া মরুভূমির উগ্র বাতাস হু হু শব্দে বহিয়া চলিতেছে!

সত্যেন এবার অনেক কথাই বুঝিতে পারিয়াছিল। বুঝিয়াছিল, জীবনের সহজ স্ফূর্তির ভিতর দিয়া তারা আর পরস্পরকে পাইবে না,—পাইতে হইলে নিদারুণ বেদনার দহনে উভয়কে জ্বলিতে হইবে। দীপালি তার এ জীবনের সবটুকু দেখুক; যা কিছু সামান্য,—জীবনের উপরিভাগেই যার স্থিতি, অন্তর্লোকে গতি যার নাই, তার আসল রূপ তার চক্ষে অনাবৃত হইয়া উঠুক, তারপর সমস্ত তলাইয়া দেখিয়া ও সুস্পষ্ট বুঝিয়া যেদিন ব্যর্থতার বোঝায় মন তার ভরিয়া যাইবে, সেদিনকার সে তিক্ততা ও রিক্ততা হইতে তাকে বাঁচাইবার জন্য সত্যেনকে প্রয়োজন হইবে। এখনো হয় তো তাকে ফেরানো যায়, কিন্তু অন্তর তার পিছনের দিকে ঝুঁকিয়াই থাকিবে; তাই মানসিক সংগ্রামে তার পরাজয়েরই সম্ভাবনা। যে দীপালিকে সে আজ দেখিতেছে, তার সহিত তাহার যেন কোনো পরিচয় নাই, মাঝখান দিয়া জলের প্লাবন বহিয়া চলিয়াছে, দু'জনে তার দুই কূলে; শুধু অস্পষ্ট ছায়ার মতো একজন আর একজনকে দূর হইতে দেখিতে পায়। তাই দুর্ব্বার শক্তিতে মন দৃঢ় করিয়া লইয়া অবশেষে একদিন সে দীপালিকে ডাকিয়া কহিল, তুমি কেমন ক'রে নিজেকে এত নীচু করতে পারো বুঝি না, আমার কিন্তু অসহ্য বোধ হয়।

দীপালির দুই ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। কহিল, কিসে, শুনি?

—তা কি তুমি জানো না? নিজেকে তুমি একেবারে ভুলে গেছ; এতদিন বলি নি, আজ আর না বলে পারি না, এ ভাবে দিনযাপনকে বেঁচে-থাকা বলে না।

—ওঃ, আমরা সামান্য মানুষ, তোমার মতন সব সময়ে অত বড় বড় কথা ভাবতে পারি না।

—বেশ, কিন্তু আমার জন্যে একটু ত্যাগ স্বীকার করতেও কি পারবে না দীপা?

দুই চক্ষে দীপালির বিদ্যুৎ ঝলসিয়া গেল। তীক্ষ্ণস্বরে কহিল, শুধু এই? আজকাল আমি যা-কিছু করি, তোমার মন্দ লাগে। তোমার ইচ্ছা যে আমি আমার নিজের সমস্ত স্বতন্ত্রতা ডুবিয়ে দিয়ে কেবল তোমার ইসারায় চল্‌ব। আমার যে একটা স্বাধীন ইচ্ছা থাকবে এ তোমার সহ্য হয় না?

এ উত্তর এতদূর অপ্রত্যাশিত যে ক্ষণকালের জন্য সত্যেনের সমস্ত চেতনা যেন স্তব্ধ হইয়া গেল। ওষ্ঠে অল্প একটু কাঁপন একবার দেখা দিয়াই থামিয়া গেল। পরম শান্ত স্বরেই কহিল, নিজের কথাগুলোর মানে বুঝতে পারো, দীপা?

—জানো, আমি তোমার ঠাট্টা শুনতে চাইছি না এখন?

—ঠাট্টা?

—হাঁ, ঠাট্টা, তা না তো 'সারমন্' দেওয়া—শুধু এই দুটোই তোমার বেশ জানা আছে। সহজভাবে কথা তো বলবে না!

—তবে আর একটু 'সারমন্' দিই, শোনো। দুটি মানুষের ধর্ম্ম, আদর্শ, কার্য্যক্ষেত্র—সমস্ত আলাদা, তবু তাদের মন দুষ্ট নয়, একজীবনে এমন অনেক দেখেছি। তাদের কেউ নিজের স্বাতন্ত্র্য হারায় না। কোনো অমিলের কথা তাদের মনে আসে না কেন জানো?—ত্যাগ-স্বীকারে তারা আনন্দ পায় ব'লে। একজন আর একজনকে যখন ডেকে বলে, এসো। দ্বিতীয় মানুষটি আর পিছনে চাইবার অবসর পায় না। আর আমাদের? তোমারই মঙ্গলের জন্যে তোমায় ডেকে পথ দেখিয়েছি, আর তুমি পিছনটাকে আঁকড়ে ধরে থেকে বলছ, যাবো না।

—বেশ তাই; কি করবে বল?

নিমেষমাত্র নীরব থাকিয়া সত্যেন বলিয়া চলিল, এ আমি বুঝেছিলুম। এতবার বলার পরেও তুমি সেই এক জায়গাতেই পড়ে রইলে। দুঃখ হয় দীপা, নিজের জীবনের এই করুণ দিকটা তুমি দেখতে পেলে না। যাক্—আমরা একসঙ্গে চলতে পারছি নে, তবে আর নিজেদের ভুল বুঝিয়ে কি লাভ?

—তুমি যা ইচ্ছা হয় কর, আমি কিছু জানি না।

এবার সত্যেনের মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। কহিল, তোমার জন্যে এতদিন আমি নিজেকে অনেক বঞ্চিত করেছি। এবার আমায় ছুটি দাও, আমার অনেক কাজ করবার আছে।

—যাও না, আমি বারণ করব ভাবছ? আমিও তোমায় চাই না—।

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই দীপালি ভয়ানক চম্‌কাইয়া

পাণ্ডুর মুখে থামিয়া গেল। চাহিয়া দেখিল সত্যেনের মুখখানা গভীর বেদনায় একেবারে কালো হইয়া গেছে।

—তাই হবে। শুধু—যদি কোনোদিন আমাকে তোমার সত্যিই দরকার হয়, জানিও, ফিরে আসব।

সত্যেন তখন নানা আয়োজনে ব্যস্ত ছিল। মুখের চেহারা ঈষৎ মলিন দেখাইলেও প্রশান্ত। যাইবার সময় আসিয়াছে; সে তার ক'জন ছাত্রকে সঙ্গে লইয়া যাইবে, দেশের সহস্র কাজ তার প্রতীক্ষা করিয়া আছে। দু'একটা পুরাতন স্মৃতি দপ্‌ করিয়া মনের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিতেছিল। দীপালির মাথার একটি কাঁটা ঘরের মেঝেয় খসিয়া পড়িয়াছে; একটা খোলা আলমারিতে সাড়িগুলি থাকে থাকে সাজানো, লাল রঙের ব্লাউসটিতে ভোরের রৌদ্র পড়িয়া বড় সুন্দর দেখাইতেছে।

দুয়ার ঠেলিয়া দীপালি ঘরে ঢুকিল। সত্যেন তখন একটা চিঠি লিখিতেছিল। চুপচাপ পাশে দাঁড়াইয়া দীপালি তার কলমের দ্রুত চলনভঙ্গী দেখিতে লাগিল। মুখ তুলিয়া চাহিয়া সত্যেন কহিল, কি?

দীপালি নতমুখে দাঁড়াইয়াই রহিল। খানিক পরে কি একটা কথা বলিতে গেল, কণ্ঠ হইতে কোনোরূপ স্বর বাহির হইল না।

মোটা সাদা খদ্দরের সাড়িখানি সে আজ বিশেষ যত্নে কেমন নূতনভাবে ঘুরাইয়া পরিয়াছে। সাদাসিধা ব্লাউসটির সম্মুখভাগে সামান্য একটু রঙিন সুতার কাজ; অনাড়ম্বর জামাটির প্রান্তে কণ্ঠ ও গ্রীবার রক্তিমাভা বড় সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে।

মুগ্ধনেত্রে সত্যেন ক্ষণকাল তার দিকে চাহিয়া রহিল। দীপালি একবার মুখ তুলিয়াই নত করিল, গাল দুইটি তার আরক্ত হইয়া উঠিল।

—কিছু বলবে, দীপা?

—তুমি সত্যিই যাচ্ছ?

অস্ফুটস্বরে সত্যেন কহিল, হাঁ।

বিদ্যুতের মত উত্তর আসিল, এ আমি কিছুতেই পারব না, আমাকেও তোমার সঙ্গে নিয়ে চল।

একবার তার মুখের পানে চাহিয়া সত্যেন কি ভাবিয়া লইল; বলিল, বুঝেছি। কিন্তু এ কষ্ট যে তোমায় সইতেই হবে, দীপা। কাছাকাছি আমরা দুজনে দুজনকে চিনলুম না, কে জানে হয় তো দূরে গিয়ে আমাদের আসল পরিচয় সুরু হবে।

—না না, তুমি আমায় নিয়ে চল, আমায় নিয়ে চল।

—সে আর হয় না, আমার দাবী যে বড় বেশী, দীপা। দিতে যেমন চাই, তেম্নি পেতেও চাই। যেমন আছি তেমনি থাকতে বলছ?—নির্ব্বিবাদে, আর দশজনের মত? আংশিক ভালবাসায় আমার যে তৃপ্তি নেই, সে আমি কিছুতেই পারব না। আমি চাই ভালবাসার সেই নিবিড়তা, যাতে একজন আর একজনের চোখের ইঙ্গিতে বুকের শিরা কেটে রক্ত ঢেলে দিতে পারে। জীবনে পরিপূর্ণতা আমার লক্ষ্য, সত্যের সঙ্গে compromise করে আরামে থাকা আমার ভাগ্যে লেখা নেই।

পাংশুমুখে দীপালি কহিল, আমার সমস্ত বুক জ্বলে যাচ্ছে, আর তুমি কি করে ওসব কথা বলছ?

দীপালির একটা হাত বুকে রাখিয়া স্নিগ্ধস্বরে সত্যেন কহিল, আমারো বড় কষ্ট হচ্ছে. এখানটা যেন জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। বলিয়া সে দুইহাতে সজোরে তার সে হাতটা চাপিয়া আঙুলগুলি নিজের মুখে চোখে বুলাইতে লাগিল। মুহূর্ত্তের জন্য বোধ হইল যেন সে মুখ সত্যেনের নয়, আর কাহারো। সমস্ত মাংসপেশী ঠেলিয়া শত শত রেখা বাহির হইয়া আসিয়া সমস্ত মুখখানা কুঞ্চিত করিয়া দিয়াছিল; সে প্রশান্ত ভাব আর ছিল না, ভয়ানক একটা উগ্রতা অনশনে মরণোন্মুখের নৃশংস ক্ষুধার মত কোনো বন্যের রূঢ় ছায়া চোখে খেলিতেছিল। দীপালির আঙুলগুলির স্নিগ্ধ-কোমল স্পর্শে ক্রমে আবার মুখের সহজ ভাব ফিরিয়া আসিল, যেন একটা বিকৃত মুখোস খসিয়া পড়িল। অসাধারণ আত্মসংযমে এ বিকৃতির লেশমাত্র চিহ্নও আর রহিল না।

সহসা সত্যেনের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তার বক্ষে

মুখ গুঁজিয়া গভীর কান্নার সুরে দীপালি বলিয়া উঠিল, ওগো, তুমি শুধু আর একটিবার বল, তুমি আমায় চাও।

সত্যেন হাসিল। শিথিল বাহুদুটি ধরিয়া সযত্নে দীপালিকে পাশে বসাইয়া দিতে দিতে কহিল, ছিঃ অমন করতে নেই। তোমায় যে বড় বেশী চাই, তাই দূরে সরে যাচ্ছি। আমার কষ্ট হবে ভাবছো? কিছু ভেবো না, এমন করে নিজেকে গড়ে তুলতে এতদিন চেষ্টা করে এসেছি, যাতে দেহমনের কোনো দুঃখই আর আমায় বিচলিত করতে না পারে।

দীপালি উঠিয়া বসিল। হাত দিয়া চোখের জল মুছিয়া সত্যেনের মুখের পানে চাহিতে চাহিতে এবার তার মুখ পাথরের মত হইয়া উঠিল। নীরবে পরস্পরের দিকে চাহিয়া তারা কতক্ষণ বসিয়া রহিল। হঠাৎ নিজের চক্ষু হইতে অতর্কিতে এক ফোঁটা অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেই ভয়ানক চমকিত হইয়া সত্যেন তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া পাশের টেবিলে কি যেন খুঁজিতে লাগিল। দীপালি একটি কথাও কহিল না, শুধু একদৃষ্টে তার মুখের পানে চাহিয়াই রহিল। তারপর কোন এক সময়ে নিঃশব্দে উঠিয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল।

বাহিরে গাড়ীর শব্দ শোনা গেল। সত্যেন উঠিয়া দাঁড়াইয়া, হাতের কয়েকটা কাজ তাড়াতাড়ি সারিয়া লইল। দীপালির হাতে লেখা ছোট একটি গানের খাতার দিকে বহুক্ষণ নীরবে চাহিয়া রহিল, তারপর একবার সেটা মুখের উপর চাপিয়া ধরিয়া বাক্সের এক কোণে রাখিয়া দিল।

সময় হইয়া আসিল। ঘরের বাহিরে আসিতেই দেখে, একটা থামে হেলান দিয়া প্রস্তর প্রতিমার মত মৌন নিশ্চল ভাবে দীপালি যেন কত কি ভাবিতেছে। কাছে আসিয়া সত্যেন একবার তার আনত মাথাটি গভীর স্নেহে স্পর্শ করিল, তারপর অত্যন্ত দ্রুত বলিয়া চলিল, যাই দীপা, ঠিকানা রইল, চিঠি লিখবে তো?

কয়েক পা চলিয়া ফিরিয়া চাহিতেই দেখে, দীপালি ঠিক তেমনই দাঁড়াইয়া আছে। মুখে তার বিষাদ বা অভিমানের এতটুকু চিহ্ন নাই, শুধু কে যেন সে মুখ হইতে সবটুকু রক্তধারা শুষিয়া বাহির করিয়া লইয়াছে।

—ছিঃ, অত মন খারাপ করতে নেই, ঘরের ভিতর যাও।

দীপালি এবার একটু হাসিল। কহিল, গাড়ীর সময় হল, আর দেরী কচ্ছ কেন?

সত্যেন এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল, একটি দৃষ্টি দিয়া যেন সে দীপালির সবটুকু আপন প্রাণে ধরিয়া রাখিতে চায়; বলিল, যাই। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

নির্মেঘ আকাশ হৈমন্তী রৌদ্রে ভরিয়া উঠিয়া যেন হাসিতেছে। একদল ছেলেমেয়ে পথে ভিড় করিয়া মহা আনন্দে চলিয়াছে; ফেরিওয়ালার ডাকে সহসা দীপালির চমক ভাঙ্গিল।—আপনার ফরমায়েসি ঢাকাই শাড়ি এনেছি, দেখুন তো পছন্দ হয় কিনা, ভাল ব্লাউজ-পিস্‌ও আছে—।

সম্মুখে চাহিয়া দেখিল, দূরে গাড়ীর পিছনটা তখনো দেখা যাইতেছে। পিছনের কাঁচে তার দুই চক্ষের অনিমেষ দৃষ্টি বহুক্ষণ নিবদ্ধ হইয়া রহিল; মোটা কাঁচের ভিতর দিয়া কিছুই দেখা যায় না। ক্রমে বাঁকের শেষে সবটুকু অদৃশ্য হইয়া গেল।

ফেরিওয়ালা তখন কয়েকটা শাড়ি বিছাইয়া ধরিয়া কহিতেছে, দেখুন তো মা, কোন্ রঙটা আপনার পছন্দ হয়।

হারানো সুর

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

'দন্তুরা কদাচিৎ মূর্খ'—শাস্ত্রবাণী।

ননীপাল এই 'কদাচিৎ' পর্য্যায়ভুক্ত, কিন্তু বুদ্ধি তাহার যেরূপ প্রখর ও সূক্ষ্ম তাহাতে সুযোগ পাইলে যে সে শাস্ত্রবাণী সফল করিতে পারিত তাহা ঠিক। সূক্ষ্ম সূঁচ পাহাড়ের গহ্বরে খাপও খায় না, খেইও পায় না।

ননীর সূক্ষ্ম বুদ্ধি বিরাট সংসারগহ্বরে ঠিক তেমনি ভাবেই খাপও খাইত না, খেইও পাইত না। কিন্তু সূক্ষ্ম শিল্পকার্য্যে তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ছিন্নবাস সূঁচের মতই খাপিয়া যাইত। শিল্প কার্য্যে তাহার নৈপুণ্য ছিল চমৎকার, কিন্তু এই নৈপুণ্য কোন গ্রহবৈগুণ্যহেতু কি না জানি না—শুধু অকাজেই প্রকাশ পাইত। সংসারে একদল লোক আছে সুস্থ সবল দেহ, জোর করিয়া বেগার খাটাও খাটিবে কিন্তু স্বেচ্ছায় খাটিয়া উপার্জ্জন করা তাহাদের ধাতে সয় না।

ননীর বুদ্ধিটাও ওই দলের। বারোয়ারীর প্রতিমার জন্য ডাকসাজ সে তৈয়ার করিতে পারে, কিন্তু ডাকসাজের ব্যবসায়ের কথায় কর্ণপাত করে না, ঐ রূপেই বাউলের একতারা দেখিয়া একতারা, সাঁওতালদের বাঁশী দেখিয়া বাঁশী তৈয়ার করিতেই এই নৈপুণ্য তাহার অপদেবতার উপসর্গটি যোগে ব্যয়িত হইত।

লোকে বলিত শুধু ওই উপসর্গটিই নয়, দেবতাটি সমেত তাহার ঘাড়ে চাপিয়াছে, কারণ দেশসুদ্ধ লোকের জমিতে যখন ধান্যশীর্ষ স্বর্ণে সুধায় অবনমিত তখন ননীর জমিতে ফুলফলহীন কোন উৎকট বৃক্ষের রূক্ষ শীর্ষ ননীর অধিকারিত্বের পরিচয় দিত।

লোকে কহে—'এ কি ভাল হচ্ছে ননী?'

ননী তখন বাঁশী বাজাইয়া বা একতারায় ঝঙ্কার দিয়া, দুঃখের অভাবে বুক বাজাইয়া গাহিয়া উঠিত—

"এ——তোমার ভাল তোমাতে থাক
আমায় তো তার ভাগ দেবে না—
এ—তোমার ভাল———।"

মোট কথা বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে বোঝা যায়, মধুর চেয়ে মাধুর্য্যের দিকে আসক্তিটাই তাহার অতিরিক্ত ছিল, তাই লোকে যখন ফলের চাষ করিত তখন সে ফুলের চাষ করিত আর লোকে যখন হিসাব নিকাশ করিত তখন সে বাঁশী বাজাইত।

লোকে বলে—'বাঁশীই বাজাইবে ননী।'

ননী প্রবলতর উৎসাহে বাঁশীতে সুর তোলে।

*　　　*　　　*

দিনের পর দিন আসে, সেই একই ভাবে; সেই প্রভাত, সেই সন্ধ্যা আলোছায়ায় মাখামাখি,—সবই সনাতন, সবই চিরন্তন; কিন্তু মানুষের দিনের পর দিনের সঙ্গে তাহার শৈশব যায়, কৈশোর আসে, কৈশোরের বৃন্তে যৌবনের মঞ্জরী ফুটিয়া উঠে, নিটোল যৌবনের পথ ধরিয়া কুঞ্চনের রেখায় রেখায় বার্দ্ধক্য দেখা দেয়, সুখের হাসি ফুরায়, দুঃখের কান্নায় দিন মলিন হয়; মানুষের দিন একভাবে যায় না।

ননীরও গেল না।

বাল্যে বিবাহিত ননীর বালিকা স্ত্রী যুবতী হইয়া আসিয়া যেদিন ঘর জুড়িয়া বসিল, সেইদিনই ননীর হাত হইতে একতারা খসিল, অধরপ্রান্ত হইতে বাঁশী নামিল।

না নামিলে উপায় কি? একতারার ঝঙ্কার পথের 'পরেই বাজে ভাল, বাঁশীর সুর বনের মাঝেই ফুটে ভাল, কিন্তু বদ্ধঘর গৃহকোণে গানও কাঁদে, গায়কেরও জমে না।

মুক্তির আনন্দ বন্ধনের মাঝে বিকাশ পায় না।

নামাইতে ইচ্ছা ননীর ছিল না, কিন্তু পত্নী গিরি কোমলাঙ্গী তন্বী হইলে কি হয়, রাশির ওজনে গিরির মতই গুরুভার ছিল, তাই গিরি ঘাড়ে চাপিতেই ভারের টলমলানিতে ঘাড় ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইতেই বেচারা ননী বাঁশী-একতারা মাটীতে ফেলিয়া দুই হাতে গিরিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ঘাড় বাঁচাইতে বাধ্য হইল।

ঘটনাটা ঘটিল প্রথম দিনেই, যেদিন গিরিকে ননী বাড়ীতে লইয়া আসিল সেই দিনই।

সকালে ননী গিরিকে বাড়ীতে আনিয়াই অভ্যাস মত পাড়া বেড়াইয়া গুন্‌গুন্ করিয়া গাহিতে গাহিতে বাড়ী ফিরিল—

"কামনা করিয়া কত পেয়েছি কাছে
ছেড়ে তো দিব না বঁধু কত কথা যে আছে।"

রন্ধনরতা গিরি ঝঙ্কার দিয়া কহিল—'মা গো মা, কি মানুষ গো তুমি! গেরস্ত ঘরের এই কি ছিরি? ঘরে না আছে একখানা কাটকুটো, কিসে রান্নাবান্না হয় বল তো? ভাগ্যে তবু এইগুলা ছিল, দেশের বাঁশী! এত বাঁশী কি হয় সাঁওতালদের ঘরের মত?'

ফুল ফেলিয়া কেহ মূলের দিকে তাকায় না, গিরির মুখ ফেলিয়া রন্ধন বা ইন্ধনের পানে ননীও চাহে নাই; গিরির কথায় কাঠের পানে চাহিতেই ননী চমকিয়া উঠিল,—সর্ব্বনাশ! বাঁশীর বোঝা উনানের মুখে, কয়টা জ্বলিতেছে!

মাথাটা তাহার দপ্ করিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই গিরির যৌবনোজ্জ্বল মুখখানি দেখিয়া তাহার অন্তরটা নরম হইয়া গেল; প্রথম দিনেই ঝগড়াটা ভাল নয় বলিয়া নয়, গিরি জানে না বলিয়া নয়, কি জানি কেন, বোধ হয় দাম্পত্য কলহ যে কারণে স্থায়ী হয় না সেই কারণটা বর্ত্তমানে প্রবলতম ভাবে ননীকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল তাই।

ননী ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বাঁশীর বোঝা তুলিতে তুলিতে মনকে বুঝাইল,—বাঁশই পুড়িল বাঁশী তো পুড়িল না, গিরির ক্রোধবহ্নিতে মদনের মত বাঁশী ভস্ম হইলেও অতনুর মত সুর তো রহিল, প্রদ্যুম্নের মত জন্মান্তর লইতে কতক্ষণ!

গিরি দেহখানা বাঁকাইয়া ননীর পানে চাহিয়া কহিল—'তুলছ যে!'

ননী ব্যস্তভাবে কহিল—'কাঠ আনছি।'

গিরি কহিল—'আনতে আনতে আখা নিবে যাবে!'

ননী কহিল—'তা ব'লে বাঁশীগুলো —'

গিরি কহিল—'তা ব'লে বাঁশীগুলো রাখ বলছি, ওতেই আমি রাঁধব। আমি সব শুনেছি বাঁশী কাঁসি বাজিয়ে আর চলবে না। রাখ ...'

গিরি বাঁশীর বোঝা ধরিয়া টান মারিয়া কথাটার উপসংহার করিল। তৈলমসৃণ বাঁশীর বোঝা টানে ননীর হাত হইতে পিছলাইয়া দাওয়ার উপর ছড়াইয়া পড়িল।

দুর্দ্দান্ত ননীর আচ্ছন্ন অন্তর ঐ এক টানেই যেন সজাগ হইয়া উঠিল, সে হাঁকিয়া উঠিল—'খবরদার, ভাল হবে না বলছি।'

হাঁকে ডাকে গিরি নড়িবার নয়, সেও একগাছা বাঁশী কুড়াইয়া লইয়া উনানের হাঁড়িটায় সজোরে এক আঘাত করিয়া কহিল—'তবে থাক্ রান্না চুলোর ভেতর।'

হাঁড়িটা ভাঙিয়া হাঁড়ির ভাত আগুন নিবাইয়া রাশিকৃত বাষ্পধূম উদ্গীরণ করিল।

স্তম্ভিত ননী বিস্ফারিত নেত্রে ধূমরাশির পানে চাহিয়া রহিল। সাধের বাসা তাহার প্রথম দিনেই সখের বাঁশীর ঘায় ভাঙিয়া অমিলনের আগুনে পুড়িয়া ধূমশিখায় উড়িয়া গেল।

গিরি গিয়া ঘরের দরজাটা হড়াম করে বন্ধ করিয়া দিয়া শুইল। ননী ক্ষণেক সেইখানে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নির্ব্বাপিতপ্রায় উনানের মুখে বসিয়া ফুঁ পাড়িয়া আগুনটাকে সজাগ করিয়া পুনরায় নিজেই রান্না চড়াইল, আর একটির পর একটি করিয়া বাঁশী অগ্নিমুখে গুঁজিয়া দিতে লাগিল।

ভাত গলিয়া ডাল হইল তবুও ইন্ধন যোগানের বিরাম নাই; বাঁশী ফুরাইল, ননী ভাত নামাইল।

সহসা ননীর বুকে খিল্ ধরাইয়া চপল হাস্যধ্বনি উঠিল—'খিল্ খিল্ খিল্।'

ননী মুখ ফিরাইয়া দেখে ও-ঘরের দাওয়ায় বসিয়া গিরি

হাসিতেছে, চোখোচোখী হইতেই গিরি কহিল—'রাগই তো পুরুষের লক্ষণ; কিন্তু দেখো, এইবার তোমার লক্ষ্মী হবে।'

ননীর বক্ষ চিরিয়া একটা হাহাকারে নিঃশ্বাস ঝরিয়া পড়িল। হায় মা কমলা! কোমলতায় কি তোমায় ধরা যায় না, কঠোর হওয়া চাই-ই!

সেই দিন ননী বাঁশী ছাড়িল,—সঙ্গীত ছাড়িয়া সম্পদের সাধনায় ডুবিল; সে ডোবা যেমন তেমন নয়,—সাধ করিয়া গলায় ভার বাঁধিয়া ডোবার মত।

সম্পদের সাধনায় সারাটা দিন মাঠে অবিশ্রান্ত খাটে, সন্ধ্যায় আসিয়া মরার মত বিছানায় এলাইয়া পড়ে,—কথা বার্ত্তা যাহা হয় তাও সংসার লইয়া, কি আছে, কি নাই ইত্যাদি।

বনের চেয়ে মন আরও নিবিড় আরও জটিল—তার অন্ত পাওয়া ভার; সেই অনন্ত নিবিড়তার মাঝে কখন্ কোন্ বৃত্তি ঘুমায়—কে কখন্ জাগিয়া উঠে, কেমন করিয়া জাগিয়া উঠে, সে ধারা বিচিত্র,—আলোর পর আঁধার জাগে যে বৈচিত্র্যে এও বুঝি সেই বৈচিত্র্য।

কে জানে গিরির সহসা কি হইল, মনে কি সুর বাজিল। কর্ম্মপ্রিয়া, লক্ষ্মীলোলুপা গিরির কিছুই যেন ভাল লাগিতেছিল না—সব চেয়ে বিতৃষ্ণা জন্মিতেছিল যেন সদাকর্ম্মরত ননীর উপর।

ভাল লাগে না, তবুও সে ভাল লাগাইতে চেষ্টা করে।

সে কয়—'কি মানুষ তুমি, হাসি নাই কথা নাই ...'

ননী কয়—'হাসি তো!'

সঙ্গে সঙ্গে একটু হাসেও, কিন্তু সে হাসি যেন ভেঙানী, গিরির গা জলিয়া যায়।

কিন্তু এ দাহ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না, দিন দিন সংসারের স্বাচ্ছল্যের শান্তির প্রলেপে এ দাহ জুড়াইয়া যায়, আবার মাঝে মাঝে এই স্বাচ্ছল্য, সঞ্চয়—এও ভাল লাগে না, ইহার মাঝেও কি অভাবের সুর বাজে—কি নাই, কি চাই!

খোশ মেজাজে গিরি সেদিন রাত্রে কহিল—'গঙ্গাজল বলছিল, তুমি বেশ গান গাইতে পার, একটা গান বল না গো।'

অভ্যাস স্বভাবের স্রষ্টা; সে শিল্পীর হাতুড়ির মত নির্ম্মম ভাবে পিটিয়া পিটিয়া অসি ভাঙ্গিয়া বাঁশী গড়ে, বাঁশী পিটিয়া অসি গড়িয়া তোলে, অভ্যাসের বশে আনন্দের রাজ্যের ননী আজ কর্ম্মী, গানের কথায় সে গা দিল না, তাচ্ছিল্যভরেই কহিল—'হ্যাঁ—গানে কি হবে?'

গিরি আব্দারের সুরে কয়—'না না, একটা বল না গো।'

ননী সেই অবহেলার সুরেই কয়—'হ্যাঃ, রোজ গান বলি, খেয়ে দেয়ে তো কাজ নাই আমার? আমার কাজ কত!'

গিরি ঝঙ্কার দিয়া কহিল—'বলি আগে তো গানের চব্বিশ পহর চল তো, যে বাঁশীর বোঝা তো আমি দেখেছি। আজ না হয় কাজ করচ; তা যে রাঁধে সে বুঝি আর চুল বাঁধে না?'

তা বাঁধে, কিন্তু চুল থাকিলে বাঁধে; চুল কাটিয়া দিয়া ও কথা বলিলে চোখে জল আসে, বুকে ঘা না লাগে এমন লোক দুনিয়ায় নাই; বিশেষ যে জোর করিয়া চুল কাটিয়া দিয়াছে, সে-ই যদি ওই কথা বলে—তাহার কথায়।

গিরির মুখে বাঁশীর কথায় গানের কথায়, সেই প্রথম দিনের কথা মনে পড়িয়া আবেগের বান বুক তোলপাড় করিয়া তুলিল, চোয়ালের উপর সজোরে চোয়াল চাপিয়া ননী যেন সে আবেগের কম্পনকে চাপিয়া ধরিল, স্থির দৃষ্টিতে নয়নের উদ্গত অশ্রুর দ্বার রোধ করিল।

গিরি আবার সেই আব্দারের সুরে কহিল—'বল না গো একটা গান!'

ননী ধরা গলায় কহিল—'গান আর হয় না।'

গিরি কহিল—'হ্যাঁ হয় না আবার, আমায় বলবে না বল।'

অভ্যাসবশে কর্ম্মকঠোর ননী স্মৃতির উত্তাপে কেমন কোমল হইয়া পড়িয়াছিল, সে গিরির এ অভিমানভরা নিবেদন উপেক্ষা করিতে পারিল না, সে গান ধরিল

"শ্যাম আবার কেন বাঁশী খোঁজ
বাঁশী যে ডুবেছে জলে।"

ঐ এক কলি গাহিতেই কেমন গলা ভাঙ্গিয়া আসে, চুপ করিয়া যায়, অন্ধকারে চোখ চাপিয়া ধরে।

গিরিও পাশ ফিরিয়া শোয়, গান ভাল লাগে না,—শুধু গান ভাল লাগে না নয়,—ঘর, সংসার, স্বামী সবের উপরেই মন বাঁকিয়া দাঁড়ায়।

ক্রমে ক্রমে এই মাঝে মাঝে 'কিছুই ভাল না-লাগা সুর' প্রবলতর হইয়া যেন সারাক্ষণই গিরির মনে বাজিতে লাগিল।

ধনে ধানে পরিপূর্ণ সংসার, অনুগত স্বামী, গিরি যাহা কামনা করিয়াছিল তাহাই পাইয়াছে তবু যেন কি নাই, কি চাই, যাহার জন্য আকাঙ্ক্ষার সকল সামগ্রী তিক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কিছুই ভাল লাগে না, সব চেয়ে ভাল লাগে না স্বামীর ওই পরম আনুগত্য।

ছয়টি রাগ আনন্দময়, তাহাদের সঙ্গিনী ছত্রিশটি রাগিনীও পুলকের ঝঙ্কারময়ী, কিন্তু সংসারের সপ্তম রাগটি রিপু, বেসুরা অশান্তি তাহার সঙ্গিনী। এই সপ্তম রাগটি সদাই অসন্তুষ্ট গিরিকে আশ্রয় করিয়া ননীর সংসারে বিষম বেসুরা রাগিনীর সৃষ্টি করিল, কারণে অকারণে গিরি অগ্ন্যুদ্গার করে, ছুতা নাতায় অশ্রুর বন্যা বহাইয়া দেয়, ননী ব্যস্ত হইয়া গিরির মন যোগাইতে চাষের কাজে আরো বেশী করিয়া মন দিল, দেনাদারদের কাছে ধানের বাকী আদায় করিতে অতিরিক্ত কঠোর হইয়া উঠিল।

তবুও গিরি সেই আগ্নেয়গিরি,—ননীর প্রাণপণ শক্তিতে স্বাচ্ছন্দ্যের ধারা বর্ষণেও সে উত্তাপ শীতল করিতে পারিল না। গিরির বিশাল মনের গহ্বরে ননীর সূক্ষ্ম বুদ্ধি আবার খেই হারাইল।

মাঘের শেষাশেষি মাঘী পুর্ণিমায় গ্রামের বাবুদের বাড়ীতে উৎসব, হরিনাম সংকীর্ত্তন, যাত্রাগান, মহোৎসব হইবে; চলিত প্রথায় সেদিন সকলের কাজ কর্ম্ম বন্ধ, আবাল বৃদ্ধ হরিনামে মত্ত, বণিতারা মাতে না,—দেখে।

ননীর কিন্তু সেদিনও বিশ্রাম নাই, সে মাঠে যায় নাই বটে কিন্তু সকালে উঠিয়া অবসর দেখিয়া খড়ের তাড়া বাঁধিতে লাগিয়া গেল।

গিরির সদাই ভারাক্রান্ত মন সেদিন আনন্দের আশায় একটু হাল্কা হইয়াই ছিল, প্রভাতে উঠিয়া ননীকে ঘরে না দেখিয়া ভাবিয়াছিল—আর পাঁচ জনের মত সেও উৎসবে যোগ দিতে গিয়াছে, নিজেও উৎসব দেখিতে যাইবার ব্যাকুল আগ্রহে তাড়াতাড়ি কাজ সারিতেছিল।

উষার আভাষে কলকণ্ঠ পাখীর মতই আজ আনন্দের আশায় গিরি হর্ষোৎফুল্লা হইয়া উঠিয়াছে।

উৎসবের কলরোল ভাসিয়া আসিতেছে, গিরি হর্ষচঞ্চল লঘুপদে গৃহকর্ম্ম সারিয়া বেড়াইতেছে।

এমন সময় খড়কুটা মাখিয়া ননী আসিয়া কহিল—'দড়ি দাও তো, দড়ি এক আঁটি।'

গিরির সকল আনন্দের ঝঙ্কার ডুবাইয়া ননীর ঐ কর্ম্ম-নীরস ধ্বনিটি বেসুরে বাজিয়া উঠিল; তাহার প্রার্থিত দড়ি যেন গিরির সকল আনন্দের কণ্ঠে জড়াইয়া সব ঝঙ্কার নীরব করিয়া দিল।

তাহার মুখের পানে, দেহের পানে তাকাইয়া গিরি কহিল—'নাম গান করতে যাও নি তুমি?'

ননী কহিল—'নাঃ, খড়গুলো সাম্লে রাখছি, দড়ি দাও তো দড়ি।'

সেই বেসুর। গিরির প্রাণটা হাহাকার করিয়া উঠিল; সে মিনতি ভরা কণ্ঠে কহিল—'না, না, আজ ও সব থাক্, যাও নাম-গান করে এসো।'

ননী কহিল, সেই আগ্রহহীন নীরস সুরে—'ওরাই ডাকছে ডাকুক, আজ আমার অব্‌সর আছে, খড়গুলো সামলে রাখি; দাও দড়ি দাও।'

না,—তবুও না! গিরির সব যেন বিষাইয়া উঠিল, সে বোঝা খানেক দড়ি আনিয়া মাটীতে আছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল—'ঐ দড়ি গলায় দাও গিয়ে। বলি—এক দিনও তো পরকালের কাজ করে লোকে! সংসার, সংসার, সংসার,—বার মাস তিরিশ দিন যে করছ, এ সব কি সঙ্গে যাবে?'

বাক্যবাণ সহিয়া সহিয়া ঘাঁটা পড়া ননীর মনে এ

আঘাত ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া গেল, ননী ক্ষণেক খেই হারার মত বিহ্বল দৃষ্টিতে গিরির পানে তাকাইয়া থাকিয়া আঁটি খানেক দড়ি লইয়া নীরবে চলিয়া গেল।

নিরুপায়ে মানুষ এলাইয়াও পড়ে আবার উন্মাদের মতও হইয়া উঠে। মিনতি, মান সব ব্যর্থ, আবার সেই সর্ব্বনাশা মর্ম্মপেশা প্রাণহীন সংসারের মাঝে ঘুরিয়া পড়িতেই গিরি পাগলের মত হইয়া উঠিল, সে, যেমন অবস্থায় ছিল তেমনি অবস্থায় ঘর-দ্বার সব ফেলিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল,—ওই উৎসবের কলরোলের পানে।

* * *

উৎসব-মণ্ডপ হইতে দূরে একটা বৃক্ষতলে আত্মগোপন করিয়া গিরি গিয়া বসিল।

তখন সংকীর্ত্তনে গাহিতেছিল—

"বাঁশী বাজাও হে বংশীধারী, সদাই, সদাই, ধরি চরণে।
কাজের মাঝে বাঁশীর ধ্বনি না শুনিলে বাঁচি কেমনে।"

গিরির সকল অন্তর ও-সুরেই ধ্বনিয়া উঠিল, সকল প্রাণ-মন জুড়াইয়া গেল; আঃ কি আনন্দ!

সেও গুন্‌গুন্ করিয়া ওই সুরে সুর মিলাইয়া গাহিল—

"কাজের মাঝে তোমার বাঁশী না শুনিলে বাঁচি কেমনে।"

* * *

আঁধারের আলোর বুকে পাখী ভাসিয়া পড়ে সব ভুলিয়া, ফিরিবার চিন্তা না করিয়াই ...

ওই আনন্দের মাঝে গিরি তেমনি ভাবেই মাতিয়া রহিল।

সন্ধ্যার পর যাত্রাগান আরম্ভ হইল, রাধাকৃষ্ণের প্রেমের অভিনয়। সে কি সুন্দর, কি মধুর! সখীগণের হাস্য-পরিহাস, ফুলতোলা, মালা গাঁথা, দুটি কিশোর-কিশোরীর প্রেমের কথা, অন্তহীন, যেন ফুরাইবার নয়, কিন্তু কথা দুটি—'তুমি আমার, আমি তোমার', সেই লইয়া মান অভিমান, সে মানের তরে কত সাধ্য সাধনা!

সুরের পর সুর ফুটিয়া উঠে ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে—ধাপে ধাপে পঞ্চমে, সপ্তমে—

গিরিরও শুষ্ক পিষ্ট সকল চিত্ত বিকল ইন্দ্রিয় যেন গানে, রসে, রূপের স্পর্শে সরস হইয়া ফুটিয়া উঠিল। ওই তরুণ কিশোর প্রেমিকটিকে তাহার বড় ভাল লাগিল, সমস্ত দেহ-মন যেন ওই তরুণ রূপটির জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল।

কিশোরী প্রেমিকা তখন গাহিতেছিল—

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর—
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।"

গিরির সমস্ত অন্তর, ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে ওই সুরের প্রতিধ্বনি তুলিল, তাহার বিহ্বল আবিষ্ট তন্ময় দেহ হইতে কখন্ বসনাঞ্চল শ্লথ হইয়া অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার হুঁস ছিল না, দীপ্ত চোখে মুখে অন্তরের ঝঙ্কার যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল—

'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর।'

তাহার এই দীপ্ত তন্ময় ছবি কাহারও চোখে পড়িয়াছিল কি না, কে জানে, তবে ওই তরুণ কিশোরটি যেন তাহারই পানে ফিরিয়া ফিরিয়া অভিনয় করিতেছিল, সে যখন সুললিত কণ্ঠে গান গাহিয়া কিশোরীর নিকট প্রেম নিবেদন করিতেছিল তখন গিরির মনে হইল ওই নৈবেদ্য তাহার চরণে আসিয়া পৌঁছিল,—

"ও দুটি চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি।"

গিরির অন্তরের অরূপ কামনা অপরূপ হইয়া ফুটিয়া উঠিল। সে রাত্রে বাড়ী ফিরিল পুষ্পিত উদ্যানের মত মাতাল মন লইয়া। বদ্ধ দ্বারে সে আসিয়া ডাকিল—'ওগো, ওগো!'

তাহার অন্তর তাহার কণ্ঠে ডাকে যেন সেই অভিনয়ের সকল আবেগ সকল সুর ঢালিয়া দিতে চাহে।

ননী দরজা খুলিয়া দিতেই গিরি ত্বরিত পদে গৃহে প্রবেশ করিয়া মুখ হাত ধুইয়া ফেলিতে লাগিল, তাহার মনে আজ আর বিলম্ব সহিতেছিল না, কত কথা, কত ভাব আজ সে প্রকাশ করিতে চায়, সে আপনাকে আজ দিতে চায়. আপনাকে পাইতে চায়।

সে শুইয়া কহিল—'কি সুন্দর যাত্রা গো!'

ননী কথা কহিল না, ঘুমের চেষ্টা করিতে লাগিল।

গিরি পুনরায় কহিল—'কি সুন্দর কেষ্ট গো, যেমন চেহারা, তেমনি গান।'

ননী পাশ ফিরিয়া শুইল।

দুর্ভিক্ষপীড়িত ক্ষুধার্ত্তের প্রত্যাখ্যানেও প্রার্থনা ছাড়া গতি নাই, সহিয়া সহিয়া প্রত্যাখ্যানেও অন্তরের গতিও তাহার প্রার্থনার দিকে। গিরির পিয়াসী অন্তর আজ এ প্রত্যাখ্যানে বাঁকিয়া দাঁড়াইল না, সে ভিখারীর মত মিনতিভরা কণ্ঠে কহিল—'ওগো!'

ননী তন্দ্রায় আবিষ্ট হইয়া আসিতেছিল, তবুও এ মিনতিতে সাড়া না দিয়া পারিল না, সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবেই উত্তর দিল—'উ!'

আহ্বানে সাড়া পাইয়া পুলকিতা গিরি আবেগে, সোহাগে উচ্ছল হইয়া এক নিমেষে অন্তরের সমস্ত নৈবেদ্য উজার করিয়া দিতে চাহিল, কিন্তু ভাষায় যে জোগায় না,—শেষে অভিনয়ের স্মৃতি তাহাকে ভাষা জুয়াইয়া দিল, সে কহিল—'প্রাণেশ্বর!'

ননীর সকল তন্দ্রা ছুটিয়া গেল, সে ঘাড় ফিরাইয়া সবিস্ময়ে গিরির দিকে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিল।

গিরি আবার কহিল, সেই স্বর সোহাগে মধুর, আবেগে করুণ—'এই পাশে ঘুরে শোও, আজ দুজনে ঘুমোব না, এস গল্প করি।'

খেই-হারা নিদ্রাকাতর ননী কহিল—'তুমি খেপেছ নাকি?' বলিয়া বিরক্তিভরে ঘুরিয়া শুইল।

রূপে গন্ধে বিকশিত ফুলটি ছিঁড়িয়া দলিয়া দিলে যেমন শ্রীহীন মলিন রূপে গন্ধে ভরিয়া উঠে—তেমনি গিরির অন্তর হতশ্রী হইয়া মলিন গন্ধে কদর্য্য হইয়া উঠিল।

পরদিন প্রাতে ননী ঘুম হইতে উঠিয়া ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছিল, গিরি তখনও উঠে নাই, অবসাদ-ক্লান্ত দেহে আহত মনে রাত্রিটা জাগিয়া ভোরের দিকে ঘুমের কোলে ঢলিয়া পড়িয়াছিল।

'ওস্তাদ! ওস্তাদ!—ননীদা হে!' বলিয়া একটি তরুণ আসিয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিল, তুলে রাখা দামী শালের মত চেহারা,—দেখিতে নবীন থাকিলেও বয়স আছে, তাহার উপর অতি ক্ষীণ গোঁফ দাড়ি কামাইয়া ফেলায় চকচকে ঘসা পয়সার মত সৃষ্টির সন তারিখ খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত। তুলে-রাখা শালের রিপু কর্ম্মের চিহ্নের মত চোখের কোলে কালী পড়িয়াছে, গালে টোল পরিয়াছে, হাতের শিরাগুলা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে; মাথায় লম্বা বাবড়ী চুল, গায়ে একটা পাঞ্জাবী, হাতে একটা বাঁশী।

ননী তাহাকে দেখিয়া সানন্দে সাগ্রহে কহিল—'আয়, আয় কড়ি আয়, কেমন আছিস্?'

কড়ি ওরফে এককড়ি ননীর মামার বাড়ীর দেশের লোক, সম্পর্কে ভাই, যৌবনের প্রারম্ভে সুরের রাজ্যের তরুণ ননীর পরম অন্তরঙ্গ ছিল, গানে বাঁশীতে ননীর শিষ্য, পরামর্শে শলায় ননীর গুরু ছিল; ননীর গুরুগিরির জোরে সে করিয়া খাইতেছে, এখন সে যাত্রার দলে থাকে। অজাতশ্মশ্রু-গুম্ফ কড়িই আমাদের যাত্রার দলের সেই কোমল কিশোর।

ননীর সম্ভাষণের উত্তরে কড়ি কহিল—'আর দাদা, না থাকা, কড়ি এখন ফুটো কাণা কড়িতে দাঁড়িয়েছে, এখন ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে না গেলে বাঁচি। তারপর তুমি তো বেড়ে রয়েছ মাইরী, দিব্যি গোলা ভরা ধান, তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে ঘর দোর, এ যে রাজার হাল ওস্তাদ! কিন্তু কাল যে তোমায় যাত্রার আসরে দেখলাম না? তোমার মত গুণী ওস্তাদ লোক গানের আসরে ফাঁক?'

ননী একটু ফিকা হাসি হাসিয়া কহিল—'আর ভাই, যে কাজের ঝঞ্ঝাট, তার ওপর একা মানুষ ...

কড়ি বেশ বঙ্কিম ভঙ্গিমায়, বিজ্ঞতার ভাণে, তরমুজের লাল বিচির মত পানের ছোপ ধরা দন্তপাটী বিস্তার করিয়া কহিল—'বাব্বারে, জিনিষের গুণ যাবে কোথা? পয়সার নেশা সকল টানই ভুলিয়ে দেয়। রাজা হয়ে কালাচাঁদ পয়সার নেশায় রাধার মুখ সুদ্ধ ভুলেছিল। তা না হয় হল, কিন্তু তেমন মিষ্টি মিষ্টি চেহারাখানা এমন চোয়াড় করে ফেল্লে কেন বল তো? বাঁশী ছেড়ে অসি ধরার ফলই এই।' এই বলিয়া সে তাহার স্বভাব কোমলকণ্ঠে গান ধরিল—

"বাঁশী ছেড়ে অসি ধরা সে কি ব্রজধামে চলে,
কি রূপ কি হ'ল হরি দেখ হে যমুনার জলে।"

ননী হাসিয়া ধমক দিয়া কহিল—'থাম্ থাম্।'

কড়ি থামিয়া গেল, ননীর কথায় নয়, সহসা তাহার দৃষ্টি কোঠার দরজায় পড়িতেই বিস্ময় বিমুগ্ধ কড়ির গান আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া গেল।

কোঠার দুয়ারে বিস্রস্তবাসা, অবগুণ্ঠনহীনা, দীপ্তনেত্রা গিরি; বিকশিত গন্ধমদির ফুলটির মত উন্মুখ কামনার বিহ্বলতা যেন মুখে চোখে ঝরিয়া পড়িতেছিল।

কড়ির দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া ননী গিরিকে দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল—'চুপ্, চুপ্, বৌ রাগ করবে।'

কড়ি কহিল—'বৌ? বেড়ে বৌ হয়েছে মাইরী।'

সুরের মোহ কাটিতেই গিরি আত্মস্থা হইয়া ঘোমটা টানিতে যাইতেছিল কিন্তু কড়ি কহিল—'ওকি ভাজবৌ, ঘোমটা কেন? আমাকে দেখে ঘোমটা চলবে না। আমি কড়ি; ননীদা আর আমি ভিন্ন নই, হরি হর বল্লেই হয়।' বলিয়াই আবার গান ধরিল—

"ঢেকেছ কেন বদন চাঁদ নীরস বাস অঞ্চলে,
ফোটা ফুলে কি পাতারই ঢাকা মানে হে অলি-চঞ্চলে?"

কেমন একটা অস্বস্তি-ভরা আনন্দে চঞ্চল হইয়া গিরি বিস্রস্ত অঞ্চলে অবগুণ্ঠন টানিয়া ত্বরিতপদে খিড়কীর দুয়ারে বাহির হইয়া গেল।

ননী কহিল—'ভাল কল্লে না, বৌ বোধ হয় রেগে গেল।'

কড়ি কহিল—'কেন?'

ননী কহিল—'বৌ গান টান্ ভালবাসে না।'

কড়ি আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—'ভালবাসে না!'

তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল শ্রোত্রীবৃন্দের সর্ব্বাগ্রে উপবিষ্টা একটি কামনাব্যগ্র, বিহ্বল, অনবগুণ্ঠিতা রূপ।

ননী কহিল—'এখান থেকে যাবি কোথা?'

চিন্তা বিভোর কড়ি অন্যমনস্কে উত্তর দিল—'থাকব দুদিন এখানে, ও-পাড়ার মামারা ধরেছে। হ্যাঁ, তারপর, দুপুর বেলা তুমি বাড়ীতে থাকবে?'

ননী কহিল—'আলুতে যে একটা ছেঁচন দিতে হবে, তা—'

ব্যগ্রভাবে কড়ি কহিল—'না—না, কাজ কামাই করতে হবে না, আমি বরং সন্ধ্যেয় আসব।' বলিয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল।

গিরি ফিরিয়া আসিয়া দেখিল কড়ি চলিয়া গিয়াছে, সে অবগুণ্ঠন মুক্ত করিয়া কহিল—'ও-ই কেষ্ট সেজেছিল গো। বেশ গলা কিন্তু, কে হয় তোমার?'

ননী কহিল—'বন্ধু লোক, মামার বাড়ীর সম্পর্কে ভাইও হয়।'

গিরি যেন উৎফুল্ল হইয়া কহিল—'তা হ'লে বল আপন জন?'

ননী কহিল—'তেমন আপন আর কি, রক্তের সম্বন্ধ তো নাই, গাঁ সম্পর্কে—'

গিরি রুষ্টভাবে কহিল—'গাঁ সম্পর্কে মুচি মিন্সেও আপন জন, আর একটা সম্পর্কও তো আছে, পর আবার কি ক'রে হল? আপন বল্লে তো খেতে লাগছে না তোমাকে?'

ননী একটু অপ্রস্তুত ভাবে কহিল—'না, না, পর্ তো বলি নাই, তবে রক্তের সম্বন্ধ কিছু নাই। নইলে বন্ধু লোক, ভাই, আপন বৈ কি।"

গিরি প্রফুল্ল মুখে সপ্রশংস হাসি হাসিয়া কহিল—'বেশ লোক বাপু ··· '

ফুলের কথা উঠিলে কুঁড়ি মনে না আসিয়া যায় না, কড়ি 'বেশ লোক' বলিতেই ননীর মনে অতীতের অন্তরঙ্গ কড়িকে মনে পড়িয়া গেল, তাহার অন্তর গিরির কথার প্রতিবাদ করিতে চাহিল, কিন্তু গিরির সম্মুখে সে কথা প্রকাশ করিতেও কেমন বাধ বাধ ঠেকিল, সে ধীরে ধীরে কোদালিখানি হাতে করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই গিরি কহিল—'কোথা যাবে?'

ননী কহিল—'মাঠে।'

সুরের রাজ্যে ঝঙ্কারের মাঝে তাল কাটিলে কেমন খট্ করিয়া মনে লাগে, ননীর কথাটিতে গিরির অন্তরে যেন তাল কাটিয়া গেল, কাজ, কাজ, কাজ! সমস্ত অন্তর যেন বিষাইয়া উঠিল।

গিরি গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল। মনে গুমোট, কিন্তু কানে গানের ঝঙ্কারের রেশ বাজিতেছিল।

শরতের মেঘের মত গুমোট ভাবটি তাহার স্থায়ী হইল না, ভুঞ্জিত পুলকের উতল হাওয়ায় গুমোটের মেঘ কোথায় সরিয়া গিয়া মনটি নির্ম্মল হইয়া উঠিল, তাহার সকল আকাঙ্ক্ষা—বিকশিত চিত্ত সদ্যপ্রাপ্ত আনন্দের আস্বাদটুকু চর্ব্বিত চর্ব্বণের মত ঘুরাইয়া ফিরাইয়া স্মরণ করিতেছিল, মনে জাগিতেছিল মান, অভিমান, সাধা, সাধনা, প্রেমের বিহ্বলতা, গান, রূপ, সুর, সুন্দর।

ধ্যানে মন মানে কিন্তু পেট মানে না।

বসিয়া বসিয়া সুন্দরের ধ্যান করিতে পেট রাজী হইল না, বিষম বিরক্তিভরে গিরি উঠিয়া রান্না চড়াইল।

মনে ঝঙ্কার বাহিরে ঝঞ্ঝাট, বেশ খাপ খায় না; গিরির কাজও ভাল লাগিতেছিল না, আর না করিলেও নয়, সে কড়াটা দুম্ করিয়া উনানের উপর চাপাইতে উনানের খানিকটা ভাঙিয়া গেল, আগুন জ্বালিতে গিয়া নিভিয়া যায়, রান্না একটা পুড়িয়া গেল, একটা কাঁচা থাকিল। সহসা এই বেসুরের মাঝে একটি সুর বাজিয়া উঠিল—'ওস্তাদ!'

সেই অস্বস্তিভরা আনন্দে গিরি চঞ্চল হইয়া উঠিল, সে তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল, পুলকিত অসোয়াস্তিতে বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করিতে লাগিল, হাতের চারিটা আঙ্গুল দিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলিটি অনাবশ্যক জোরে মচকাইতে লাগিল।

কড়ি আসিয়া শূন্য অঙ্গনে দাঁড়াইয়া চারিদিক চাহিয়া কহিল—'কৈ ওস্তাদ, কোথায়? বাড়ীতে ত নাই। গেল কোথা?—ওস্তাদ!'

কিন্তু বাড়ীতে নাই বলিয়া তাহার চলিয়া যাইবার কোন চেষ্টা দেখা গেল না, সে রান্না-ঘরের অর্দ্ধরুদ্ধ দুয়ারের পানে তাকাইয়া দিব্য রান্না-ঘরের দাওয়ায় উঠিয়া বসিয়া স্বেচ্ছায় কৈফিয়ৎ দিল—'আচ্ছা একটু বসি, এখুনি আসচে সে।'

তারপর ধীরে ধীরে হাতের বাঁশের বাঁশীটায় সুর তুলিল, বাদকের নৈপুণ্যে বাঁশী জাগিয়া উঠিল, ঝঙ্কারের পর ঝঙ্কারে একটা মোহের রাজ্য গড়িয়া তুলিল। সহসা কড়ি বাঁশী থামাইয়া দুয়ারের পানে তাকাইয়া হাসিয়া কহিল—'একটু জলদাও তো ভাজবৌ, গলাটা শুকিয়ে উঠেছে।'

তখন অর্দ্ধরুদ্ধ দুয়ার পূর্ণ মুক্ত,—আর সেই মুগ্ধমুখী দীপ্তনেত্রা অবগুণ্ঠনহীনা গিরি সেখানে দাঁড়াইয়া।

সুর টুটিয়া কথার ঘায়ে চমক ভাঙ্গিতেই গিরি ঘোমটা টানিতে গেল, কিন্তু কড়ি হাত জোড় করিয়া কহিল—'ও কি ভাজবৌ, আবার ঘোমটা কেন, আমি কি তবে পরই হলাম?'

আড়ি পাতিয়া ধরা পড়িলে তরুণীর মন যে সলজ্জ পুলকে ভরিয়া উঠে, সেই পুলকিত লজ্জায় গিরি রাঙা হইয়া উঠিল, মৃদু হাসিয়া অস্ফুট জড়িত কণ্ঠে কহিল—'না—না—'

কড়ি কথায় লজ্জা ভাঙিবার প্রয়াস না করিয়া কাজে ভাঙাইয়া দিল, কহিল—'তবে একটু জল দাও তো ভাই!'

শুধু জল কি দেওয়া যায়, বিশেষ আপন জন! গিরি আধ-ঘোমটা টানিয়া রেকাবীতে দুখানা বড় বাতাসা, তোলা সরফুলো গেলাসে জল নত দৃষ্টিতে বহিয়া আনিয়া নামাইয়া দিল।

কড়ি কড় কড় করিয়া বাতাসা দুইখানা চিবাইয়া ঢক্ ঢক্ করিয়া জল খাইয়া কোঁচার খুঁটে মুখ মুছিতে মুছিতে কহিল—'দান তো হ'ল, দক্ষিণেটা দাও,—পান গো, পান!' বলিয়া গাহিয়া উঠিল—'ও তোমার হাতের মিঠি-খিলি, খেলে বয়স বাড়ে না!'

গিরির অন্তরটা ছি-ছি করিয়া উঠিল, মনটা কেমন বাঁকিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু আপন জন—অসম্মান করা তো যায় না, লজ্জায় বিরক্তিতে আসিয়া পানের ঘরে পান লইতে লইতে ভাবিতেছিল,—নাঃ, যাইয়া কাজ নাই, আর উহার সম্মুখে বাহির হইব না।

কিন্তু দেখা দিব না বলিলে কি হয়, সে যদি দেখিতে সম্মুখে আসিয়াই হাজির হয় তো দেখা না দিয়া উপায় কি; নিজে ছাড়িলেও কম্‌লি যদি না ছাড়ে—তবে ছাড়ায় কি করিয়া?—

কড়ি একেবারে পানের ঘরের দুয়ারে হাজির হইয়া মিনতি ভরিয়া মিষ্ট কণ্ঠে কহিল—'রাগ কল্লে ভাই ভাজবৌ? —রাগ করো না, আমি ভাই একটু আমুদে লোক,— আনন্দের রাজ্যের লোক কি না!'

'তাই, তাই,' গিরির অন্তর নিশ্চিন্ত নিশ্বাসে সায়

দিয়া উঠিল—তাই, তাই, আনন্দের রাজ্য যে চঞ্চল, একটু উচ্ছল।

কড়ি উত্তরের প্রত্যাশা না করিয়াই হাতটা গিরির সম্মুখে মেলিয়া দিয়া কহিল—'পান দাও।'

হাতে হাতে পান দিতে গিরির মনটা কেমন কেমন করিতেছিল, আবার ঐ আনন্দের রাজ্যের কৈফিয়ৎটা ব্যাপারটা একটু লঘুও করিয়া দিতেছিল; এই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' সমস্যার সমাধান করিয়া লইল কড়ি নিজেই, সে নিজেই গিরির হাত হইতে পান দুইটা মৃদু আকর্ষণে টানিয়া লইয়া গিরিকে এই ঘটনাটার উপর কোন চিন্তা করিতে না দিয়াই কহিল—'ভাজবৌ, তুমি নাকি গান ভালবাস না?'

প্রিয়কে অপ্রিয় নেত্রে দেখার অভিযোগ বড় কঠিন, সহ্য হয় না।

গিরি দীপ্ত প্রতিবাদে কহিয়া উঠিল—'মিছে কথা।'

কড়ি কহিল—'তোমার কত্তাই তো বল্‌ছিলো ভাই।'

গিরি সরোষে কহিয়া উঠিল—'নরুকে মিন্সে নিজে যেমন, তেমনি সবাইকে ভাবে।'

কড়ি কোন কথা না কহিয়া বাঁশীতে ফুঁ দিল। বাঁশী বাজিল, ছন্দে, সুরে, কড়িতে, কোমলে, ঝঙ্কারে, ঝঙ্কারে সর্ব্বদেহে, মনে শিহরণ-প্রবাহ ঢালিয়া দিয়া বাজিয়া চলিল।

গিরি তেমনি দাঁড়াইয়া—বিভোর, উচ্ছল।

বাঁশী থামিল।

কড়ি কহিল—'কই ওস্তাদ তো এলো না, আমি তবে আসি।'

গিরি কহিল, মৃদু কণ্ঠে আবেশের মাঝে—'না, না, বাজাও, আরও বাজাও'

আবার বাঁশী বাজিল এবার হিল্লোলিত, চটুল, লাস্যভরা গতিতে, মদির ছন্দে, সকল চিত্ত অধীর করিয়া শোণিতের ধারায় ধারায় অগ্নিতপ্ত ক্ষুধার অনুভূতি ফুটাইয়া।

সহসা আত্মহারা গিরি একটা আকর্ষণে কড়ির বুকের উপর গিয়া পড়িল, কড়ি সুযোগ বুঝিয়া আত্মহারা বিহ্বলা গিরির হাত ধরিয়া আপন বক্ষে টানিয়া দিল।

স্পর্শেরও রূপ আছে, অনুভূতি তাহা প্রত্যক্ষ করে, প্রখর গ্রীষ্মে, হিম যখন কাম্য, তখনও সর্পের শীতলস্পর্শে সুসুপ্তের সুপ্তি ভাঙ্গিয়া যায়।

সুরে স্বপ্নে সুপ্তা গিরিও সর্পস্পৃষ্টার মত চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। সবলে পাপক্ষীণ কড়িকে দূরে ঠেলিয়া দিয়া হাতের কাছের পানের বাটাখানা লইয়া সজোরে কড়িকে আঘাত করিল, বাটাখানা গিয়া লাগিল কড়ির পায়ের গোছে, লাগিতেই কাটিয়া গিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল।

কড়ি একটা কুৎসিৎ বাক্য কহিয়া উঠিয়া গিরিকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টায় উদ্যত হইতেই গিরি তরকারী কোটা বঁটীখানা তুলিয়া কহিল—'বেরিয়ে যাও!'

সভয়ে কড়ি আহত পদেই খঞ্জ লম্ফে গৃহত্যাগ করিয়া পলাইল, সাধের বাঁশীটা তাহার পড়িয়া রহিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বাঁশীটা উদ্ধারের চেয়ে সর্ব্বনাশীর হাত হইতে উদ্ধার পাওয়াই সর্ব্ববাদী সম্মত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমানের কাজ;—বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ননী।

গিরি বঁটীটা আছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া মুখে আঁচল দিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, তাহার অন্তরে হাহাকারের সুরে ধ্বনি উঠিল—

'এ নয়, এ তো নয়, এ কি—, সে কি?'

তরল বলিয়া গরল জল নয়, পানে পিয়াসা তো মেটেই না, মরণের যাতনাই সার হয়।

গিরির মরিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

লজ্জায়, ঘৃণায়, ভ্রমের জন্য অনুশোচনায়, অশান্তির অগ্নিদাহের কাছে মরণ—হউক তার পথ, রাজ্য অজ্ঞাত—রহস্যের অন্ধকারে ভরা, তবু—তবু প্রত্যক্ষ অগ্নিদাহের চেয়ে সে অন্ধকারও ঢের ভাল মনে হইল।

কিন্তু মরণকে ডাকিলেই মরণ তো আসে না—, আসিলেও গল্পের কাঠুরিয়ার মত মানুষ তাকে বিদায় করিয়া বাঁচিতেই চায়।

মরণকে বরণীয় মনে হইলেও স্বহস্তে মরণের ব্যবস্থা আর পাঁচজনের মতই গিরি করিতে পারিল না।

শুধু বড় যাতনায় গিরি ছটফট্ করিতে লাগিল, সে কি

যাতনা, দারুণ পিপাসায় বিষপানে মৃত্যুর যাতনা, কিন্তু তাহা ছাপাইয়াও পিপাসার ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা—জল—জল!

সহসা 'কৈ গিরি কৈ' বলিয়া মোট পুঁটুলী কাঁখে কয়জন নারী গৃহে প্রবেশ করিল; গিরি ফিরিয়া দেখিল তাহার মা ও আর কয়জন বাপের বাড়ীর আত্মীয় স্বজন।

দারুণ অশান্তির মাঝে সঙ্গের, সান্ত্বনার আশ্রয় পাইয়া গিরি বাঁচিয়া গেল, সে ব্যাকুল আগ্রহে কহিল—'মা—মা!'

মা স্নেহভরে কহিলেন—'হ্যাঁ মা, শ্রীধাম যাব দোল দেখতে, তাই পথে তোর সাথে দেখা করতে এলাম।'

গিরি কহিল—'শ্রীধাম যাবে?'

সুরটা শুধু প্রশ্নের নয়, কল্পনার স্বপ্নেও জড়িত; তারপর আপনার সমবয়সী একটি বিধবার পানে ফিরিয়া কহিল—'তুইও?'

সে হাসিয়া হাত নাড়িয়া কহিল—'হ্যাঁ লো, শুনে আসি, শ্যামের বাঁশী!'

গিরি স্বপ্নাবিষ্টার মতই প্রশ্ন করিল—'সত্যি সেখানে বাঁশী বাজে?'

একজন প্রবীণা কহিল—'বাজে না? বাজে বৈ কি, কিন্তু সে কি সবাই শুনতে পায়? যার প্রাণ কাঁদে সে-ই পায়। আমরা কি আর—'

ঠোঁট চাপিয়া একটা হতাশার পিচ কাটিয়া সে কথাটার উপসংহার করিল।

গিরি ছোট মেয়েটির মত চপল চাঞ্চল্যে একটা বিপুল আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিল—'আমিও যাব।'

* * *

মা কহিল—'তা কি হয়, জামাই কি বলবে?'

গিরি কাঁদিয়া, রাগিয়া, মরিবার ভয় দেখাইয়া শেষে জিতিল।

মা কহিল—'দেখ বাপু, জামাই বলে তো চলো।'

বেলা শেষে ননী বাড়ী ফিরিতেই গিরি বিনা ভূমিকায় কহিল—'আমি মায়ের সঙ্গে শ্রীধাম যাব।'

ননী চমকিয়া উঠিয়া কহিল—'সে কি? তা কি হয়?'

গিরি সরোষে কহিল—'কেন হবে না? আমি যাবই।'

ননী কহিল—'আমি একা মানুষ, এই ঘর দোর'

গিরি বিপুল উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া কহিল—'তোমার পায়ে পড়ি গো, তোমার ঘরের বোঝা তুমি নাও, আমায় খালাস দাও, ছেড়ে দাও, মানা করো না।'

ননী কতক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, কত চিন্তা কত কথা মনে উঠিল, ডুবিল; শেষ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—'তবে যাও।' বলিয়া সে ধীরে ধীরে খিড়কীর ঘাটে পা ধুইতে গেল। অন্যদিন হইলে কতক্ষণ তাহার পা ধোয়া হইয়া যাইত, কিন্তু আজ ঘাটের উপর রক্ষিত একখানা ইঁটে পা ঘষিতেই লাগিল, ঘষিতেই লাগিল।

বুকে তাহার কত যে ব্যথার কথা সে তো মুখের ভাষায় ফুটিবার নয়, দুঃখের ভাষাই যে দীর্ঘশ্বাসে, অশ্রুধারায়; কয় ফোঁটা অশ্রু তাহার বুক বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল, শেষে সে দুঃখ রূপ পাইল ননীর অতীতের সুখের সাথী সব-ভোলানো গানে।

ননী বহুদিন পরে গুন্‌গুন্ করিয়া গান ধরিল—

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু—
অনলে পুড়িয়া গেল।"

* * *

শেষ রাত্রে যাত্রীর দল বাহির হইবে; গিরি মোট বিঁড়া বাঁধিয়া আজ যাত্রীর দলেই শুইয়াছে; বড় আশায় সে বুক বাঁধিয়াছে—ব্রজের বাঁশী শুনিবে, সে শান্তি পাইবে, আঃ সে চির-পবিত্র চির-আনন্দময়!

কিন্তু তবু এই আনন্দের মাঝে যেন ক্ষীণ রোদনের করুণ উদাস সুর বাজে। গিরি ঘুমাইতে পারিল না।

কতক্ষণ পরে তাহার ক্ষীণ তন্দ্রা আসিয়াছে, সহসা কানে আসিয়া পশিল বাঁশীর সুর, মধুর! মধুর! এই সুরই সে যেন চায়! আহা হা!

ব্রজের বাঁশীর সুর তাহাকে এতদূরেও ডাকিল!

মাঘী শেষের কৃষ্ণা দ্বিতীয়ার প্রায়-পূর্ণচন্দ্রের মদির জ্যোৎস্না জানালাটার ভাঙ্গা ফাঁক দিয়া উঁকি মারিতেছিল; গিরি আর থাকিতে পারিল না, সে পথশ্রান্ত সুষুপ্ত

যাত্রীদলের মাঝ হইতে উঠিয়া ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

* * *

নির্দ্দিষ্ট স্থানে পাতা শয্যাটির নির্দ্দিষ্ট অংশে একা শুইয়া ননী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, আজ তাহার মনের কথার ভাষাই ওই। তার মনে হইল, তাহার পাতান ঘর জন্মের মত ভাঙ্গিয়া গেল! হায়, গিরির জন্য সে না করিয়াছে কি? বাঁশী ছাড়িয়াছে, গান ছাড়িয়াছে, উৎসব ভুলিয়াছে, —আপনার মর্ম্মখানি নিঙারিয়া গিরির পা দুটি রাঙাইয়া দিয়াও সে গিরিকে পাইল না! গিরি ধরা দিল না! গভীর বেদনায় তাহার মনটা টন্ টন্ করিয়া উঠিল, সে ঘর খুলিয়া দাওয়ার উপর আসিয়া বসিল।

শুভ্র জ্যোৎস্নায় সুন্দরী ধরণী, ননী যেন একটু আরাম পাইল, সে চাঁদের পানে চাহিয়া রহিল।

কতক্ষণ কাটিয়া গেল, ঘাড় ধরিয়া উঠিতে ননী দৃষ্টি নামাইল।

চক্ চক্ করিতেছে ওটা কি?

কুড়াইয়া লইয়া দেখিল,—বাঁশী।

মদির জ্যোছনায় নির্জ্জনে পাইয়া বেদনায় সান্ত্বনার আশা দিয়া বাঁশী তাহাকে যেন কহিল—'বাজাও, বাজাও!'

অতি মৃদু সুরে বাঁশী বাজিল, ক্রমে ক্রমে সুর উচ্চ হইতে আরো উচ্চে উঠিয়া বাজিয়াই চলিল, বাজিয়াই চলিল

সহসা কাহার স্পর্শে চমকিয়া ননী ঘুরিয়া দেখিল পাশে বসিয়া গিরি।

বাঁশী বন্ধ করিয়া অপ্রস্তুত ভাবে অপরাধীর মত ননী কহিল—'বাঁশীটা পড়েছিল তাই—তাই'

গিরি সোহাগের রাশি ঢালিয়া ননীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—'না, না, বাজাও, বাজাও, আবার বাজাও!'

বাঁশী আবার বাজিল, বাজিয়াই চলিল।

সহসা গিরি হাত দিয়া ননীর মুখ হইতে বাঁশীটা নামাইয়া দিয়া পুলকে, কৌতুকে, আদরে, লজ্জায় মাখামাখি করিয়া কহিল—'আমি তো আর যাবো না।'

ননী ব্যগ্রভাবে কহিল—'যাবে না, সত্যি?'

সোহাগে সুখে এ-পাশ হইতে ও-পাশ পর্য্যন্ত ঘাড় নাড়িয়া গিরি কহিল—'না গো, না!'

পুলকের ছোঁয়াচে ননীও বিভোর হইয়া উঠিয়াছিল, পরম-তৃপ্তিতে, চরম-আগ্রহে গিরিকে বুকে টানিয়া তাহার হাস্য ভরা ওষ্ঠাধর হইতে হাস্য রেখার ছাপ তুলিয়া লইল।

তারপর সকৌতুকে কহিল—'তীর্থের সাজ খুললে কি হয় জান তো?'

গিরি তাহার বুকে মুখ লুকাইয়া কহিল—

"এই তো আমার তীর্থ, মধুর, মধুর বংশী বাজে,
এই তো বৃন্দাবন।"

(উপন্যাস)

শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী

সন্ধ্যাবেলা জয়া তার ঘরে একলাটি বসে ভাবছিল। সে ভাবছিল যে, পুরুষ জাতটাই এম্নি প্রেমিক, না মধুমাসে মানুষের মন নিয়ে কামদেবের এ এক খেলা মাত্র। প্রায় দু-বছর হোলো জয়া জমিদার গোপিকারমণ বসুব দুই মেয়ে ইলা ও বেলার শিক্ষয়িত্রীরূপে এ বাড়ীতে এসেছে, কিন্তু এতদিন এ রকম চিন্তাব অবকাশ সে পায়-নি। জমিদার মশায়েরা আজ মাস দুই হোলো মধুপুরে বেড়াতে এসেছেন। প্রথম মাসটা বেশ নিরুপদ্রবেই তার কেটেছিল। কিন্তু মধুমাসের মাঝামাঝি নাগাদ মধুপুরের অবস্থা সঙ্গীন হ'য়ে দাঁড়াল।

দুই-সপ্তাহ আগে জয়া তার ছাত্রী দুটিকে নিয়ে মোটর কোরে দূরে বেড়াতে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ তাদের সঙ্গে মাঠে ছুটোছুটি কোরে ক্লান্ত হোয়ে বিশ্রামের জন্য মোটরে এসে বস্‌তে না বস্‌তেই জমিদার বাবুদের মোটরচালক নির্ম্মল অতি মোলায়েম ও চোস্ত ভাষায় তাকে প্রেম নিবেদন ক'রলে।

জয়া এর জন্তে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ নির্ম্মলের মুখে প্রেমের বুলি শুনে সে একেবারে হক্‌চকিয়ে গেল। নিজের ছাত্রীদের সঙ্গে ছাড়া বাড়ীতে কারুব সঙ্গে সে মেলামেশা করত না। এই নির্ম্মল, প্রত্যহ তাকে ও তার ছাত্রীদের নিয়ে মোটরে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু এতদিন জয়া ভাল ক'রে তার দিকে চেয়েও দেখে-নি। বাড়ীর কর্ত্তা থেকে আরম্ভ কোরে আট দশ বছবেব ইলা বেলা পর্য্যন্ত তাকে নাম ধবে ডাকে, হঠাৎ কি সাহসে সে তাকে প্রেম নিবেদন করতে সাহস করলে, প্রথমটা তাই ভেবে সে অবাক হোয়ে গেল। কিছু বল্‌তে না পেরে জয়ার চোখ মুখ লাল হোয়ে উঠতে লাগ্‌ল।

নির্ম্মল সংস্কৃত জান্‌ত না বটে, কিন্তু সংস্কৃত বুলি দুটো চারটে তার জানা ছিল। জয়াকে চুপ কোরে থাকতে দেখে সে মনে করলে—মৌনং সম্মতি লক্ষণম্। উৎসাহের সঙ্গে সে বলতে আরম্ভ করলে—দেখুন মিস্ ঘোষ, আমি একশো টাকা মাইনে পাই, তা ছাড়া পঁচিশ ত্রিশ টাকা উপরি আছে। শীগ্‌গীরই গাড়ী-মেরামতের একটা কারখানা খোল্‌বার ইচ্ছা আছে। যত দিন তা না করচি ততদিন এই একশো পঁচিশ টাকায় আমাদের দুজনের সংসার বেশ চলে যাবে।

জয়া এবারেও কোনো উত্তর দিলে না। নির্ম্মলের কথাগুলো শুনে তার রাগ হচ্ছিল কিন্তু তার শিক্ষার মধ্যে এমন একটা সহবৎ ছিল যে, চেষ্টা কোরেও সে কারুকে আঘাত দিতে পারত না।

ওদিকে জয়াকে চুপ কোরে থাকতে দেখে নির্ম্মল উত্তরোত্তর সাহসী হোয়ে উঠতে লাগল। সে মোটর হাঁকাবার আসনে বসেছিল, একবার তার মনে হোলো ভেতরে জয়ার পাশে গিয়ে বসি। কিন্তু ইলা বেলা কাছেই ছুটোছুটি করছিল, পাছে তারা দেখে ফেলে কি মনে করে এই আশঙ্কায় হৃদয়াবেগকে কোনো রকমে সংযত কোরে সেখানে বসেই সুরু করলে,—আমি শুনেছি যে আপনারা ব্রাহ্ম। তা ব্রাহ্মমতে বিয়ে করতে আমার কোন আপত্তি নেই—

এই অবধি বলেই জয়ার মুখের দিকে চেয়ে নির্ম্মল তার কথা থামিয়ে ফেল্লে। একবার তার মনে হোলো—একটু বেশী হোয়ে যাচ্ছে বোধ হয়। কিন্তু সংস্কৃত বুলির মতন ইংরেজি বুক্‌নিও তার দুটো চারটে জানা ছিল। তার মনে পড়্‌ল—কাপুরুষেরা জীবনে অনেকবার মরে—। তৎক্ষণাৎ সাহস সঞ্চয় কোরে নির্ম্মল আবার সুরু করলে—কিন্তু একশো পঁচিশ টাকায় যে আমাদের চিরকাল চল্‌বে এমন কথা আমি বল্‌চি না। আজ একশো পাচ্ছি—

জয়ার আর সহ্য হোলো না। এবার সে দৃঢ়স্বরে বলে উঠ্‌ল,—চুপ করুন। এই একশো টাকার চাকরীটি যদি খোয়াতে না চান তা হোলে আর একটি কথাও বলবেন না।

জয়ার মনের মধ্যে এতক্ষণ যে এই কথাগুলো ধোঁয়াচ্ছিল নির্ম্মল তা স্বপ্নেও ভাবে-নি। সে বেচারী শহরের সদর রাস্তায় নির্ভয়ে মোটর হাঁকিয়ে বেড়ায়। নারীর অন্তরের দুর্গম পথ-ঘাট তার মোটেই চেনা ছিল না। জয়াকে চুপ কোরে থাকতে দেখে বিবাহিত জীবনের অনেকগুলি রঙিন চিত্র ইতিমধ্যে সে মনের মধ্যে এঁকে ফেলেছিল। হঠাৎ তার মুখ থেকে এই কথাগুলো শুনে সে একেবারে দমে গেল। যে একশো টাকা তাকে বিবাহের প্রস্তাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল তার আসন্ন অবস্থার সম্ভাবনায় সে বিচলিতও বড় কম হোলো না। কিন্তু মোটরচালক হোলেও নির্ম্মল চালাক ছেলে। মুহূর্ত্তের মধ্যে সে নিজের কর্ত্তব্য স্থির কোরে ফেল্লে। কিছুক্ষণ চুপ কোরে থেকে সে হাত জোড় কোরে জয়াকে বল্লে—মিস্ ঘোষ, আমায় মাপ করবেন। দয়া কোরে এ কথা আর কর্ত্তার কানে তুলবেন না।

সহসা নির্ম্মলের এই ভাব পরিবর্ত্তন দেখে জয়ার হাসি পেল। কিন্তু হাসি চেপে সে গম্ভীরভাবে বল্লে—আচ্ছা বল্‌ব না, কিন্তু সাবধান। এখন যান ইলা বেলাকে ডেকে নিয়ে আসুন, সন্ধ্যার আগেই বাড়ী ফিরতে হবে।

সাত দিন পরের ঘটনা।

রাত্রি তখন বোধ হয় ন'টা। জয়া তার ছাত্রী দুটিকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে পড়বার জন্য নিজের টেবিলের কাছে এসেই দেখতে পেলে তার নামে একখানা খাম পড়ে রয়েছে। বাড়ীর চিঠি মনে কোরে খামখানা তুলেই সে বুঝতে পারলে যে, সেটা ডাকে আসে-নি। খামখানা গোলাপী আর তা থেকে ফুর্ ফুর্ কোরে সুগন্ধ বের হচ্ছে। জয়া তাড়াতাড়ি চিঠিখানা খুলে পড়তে আরম্ভ করলে।

চিঠির কাগজের ওপরে অর্দ্ধ-উলঙ্গ একটি নারীর ছবি। পাশে ফুল গাছ, নীচে ছাপার অক্ষরে লেখা,—ভুলেছ কি ভালবাসা!

সেখানি একটি প্রেমপত্র। ছ-পৃষ্ঠাব্যাপী প্রেমের উচ্ছ্বাস, কখনো কবিতা কখনো গদ্য। লেখকের প্রেমের মাত্রা যে তার ভাষাজ্ঞানকে অতিক্রম কোরে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে চিঠিখানি পড়্‌লে তার আর সন্দেহ থাকে না। চিঠির উপসংহারে লেখা—যদি দয়া কোরে এই প্রেম-ভিখারীর চিঠির উত্তর দাও তা হোলে তোমার ঘরের দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে বাগানে ফেলে দিও। দিনের বেলায় ফেলো না, কারুর চোখে পড়ে যেতে পারে, রাত্রে ফেলো।

ইতি—

জনমে মরণে তোমারই হতভাগ্য—কুঞ্জ

প্রেমপত্রখানি আদ্যোপান্ত পড়ে জয়া দস্তুরমতন ভড়্‌কে গেল। তার প্রেমভিখারী জনমে মরণে—এই হতভাগ্যটি যে কে তার কিছুতেই সে ঠিক করতে পারলে না। একবার

তার মনে হোলো, হয় ত এ নির্ম্মলেরই কারসাজি। কিন্তু নির্ম্মলের সেদিনকার সেই আকুতিভরা মুখখানা মনে পড়তেই তার মনে হোলো, না এ পথে সে আর এগুবে না। তবে—

জমিদার বাড়ীতে কুঞ্জ নামে একটি সরকার ছিল। কিন্তু তার হালচাল দেখে তাকে অতি গোবেচারী বলে বোধ হয়। সে এ রকম চিঠি লিখতে পারে এ কথা প্রথমটা সে বিশ্বাসই করতে পারলে না। কিন্তু এ কুঞ্জ না হোলে আর কোন্ কুঞ্জই বা তার ঘরের মধ্যে এসে চিঠি রেখে যেতে পারে! ভাবতে ভাবতে জয়ার মনে হোলো, এ নিশ্চয় সেই সরকার কুঞ্জেরই কাজ। এর পরেই তার ভাবনা হোলো, চিঠিখানা নিয়ে এখন কি করা কর্ত্তব্য। কুঞ্জ এ বাড়ীতে বহুকাল ধরে চাকরী করচে। তার বাবাও নাকি এ বাড়ীর সরকার ছিল। কুঞ্জকে না হোলে এ বাড়ীর কারুরই এক মুহূর্ত্তও চলে না। সে যে এ চিঠি লিখেছে তা প্রমাণ নাও হোতে পারে। অথচ এ রকম চিঠি পেয়ে চুপ কোরে থাকলেও সে ব্যক্তি আস্কারা পেয়ে যাবে। একটার পর একটা ভাবনার ঢেউ এসে জয়াকে অভিভূত কোরে ফেল্লে। নিজেকে তার এত বেশী অসহায় মনে হোতে লাগ্‌ল যে, সে কেঁদে ফেল্লে।

হঠাৎ খুট্ কোরে কিসের শব্দ হোতে জয়া মুখ তুলে দেখলে যে, ইলা তখনো এপাশ-ওপাশ করচে। সে তাড়াতাড়ি আলোটা নিভিয়ে দিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

রাত্রি বেশী না হোলেও চারিদিক নিঝুম। শুক্লা অষ্টমীর চাঁদখানা নীল আকাশে পাল তুলে উধাও হোয়ে চলেছে। তারই ক্ষীণ আলোর সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠনের আড়ালে রহস্যময়ী ধরণী যেন কার সঙ্গে একান্ত হোয়ে রয়েছে। থেকে থেকে বাগানের ঝাউ গাছগুলোর সর্ সর্ আওয়াজে সে যেন চম্‌কে উঠ্‌ছিল।

জয়া কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে জানলাটা ভেজিয়ে বাইরের বাগানের একটা বেঞ্চির ওপরে গিয়ে বস্‌ল। ঘরের মধ্যে বন্ধ হাওয়ায় তার চিন্তাস্রোত যেন প্রতিপদেই বাধা পেয়ে দ্বিগুণ জোরে ফিরে এসে তাকে উতলা কোরে তুলছিল। বাইরে প্রকৃতির সেই মুক্ত আবহাওয়ায় তার চিন্তাও যেন মুক্তি পেলে।

অনেকক্ষণ একভাবে সেখানে বসে থাকার পর হঠাৎ তার চোখ পড়্‌ল দূরে একটা গাছের নীচে কে যেন বসে রয়েছে। জয়া এতক্ষণ নিজের চিন্তাতে বিভোর হয়েছিল, হঠাৎ লোক দেখে তার সেই প্রেমপত্রখানার কথা মনে পড়ে গেল। তার মনে হোতে লাগ্‌ল, যে চিঠি লিখেছে সে এখানে এসে বসে নেই তো! একবার সে ভাবলে এখান থেকে ছুটে ঘরের মধ্যে পালিয়ে যাই। কিন্তু সে ওঠ্‌বার আগেই গাছের তলার সেই লোকটা বেঞ্চি থেকে উঠে আস্তে আস্তে তার দিকে অগ্রসর হোতে লাগ্‌ল। জয়ার আর ওঠা হোলো না, সে স্থির হোয়ে সেইখানে বসে রইল।

লোকটি এগিয়ে এসে জয়াকে দেখে বল্লে—কে এখানে বসে? ও মিস্ ঘোষ! আমি মনে করলুম এত রাত্রে কে এসে বাইরে বস্‌ল!

বাগানের মধ্যে এত রাত্রে লোক দেখে জয়া মনে করেছিল নিশ্চয় এ ব্যক্তির সঙ্গে সেই পত্রখানার ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। কল্যাণকে দেখে সে আশ্বস্ত হোলো বটে কিন্তু রাত্রে এই নির্জ্জন বাগানে তার সামনে পড়ে গিয়ে তার মনে হোতে লাগ্‌ল যেন একটা অপরাধ করতে গিয়ে ধরা পড়ে গিয়েছে। লজ্জা ও কুণ্ঠায় সে তার কথার কোনো জবাব দিতে পারলে না।

কল্যাণ জমিদার গোপিকারমণের একমাত্র পুত্র। সে বিলেতে পড়ছিল, সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য দেশে ফিরেছে। জয়া তার কথার কোনো উত্তর দিলে না দেখে সেও কেমন একটু অপ্রস্তুত হোয়ে পড়্‌ল। তারপর, উভয়পক্ষের এই নিস্তব্ধতা অস্বাভাবিক রকমের দীর্ঘ হোয়ে পড়্‌ছে দেখে কল্যাণই আবার প্রশ্ন করলে—আপনার কি কোনো অসুখ কর্‌চে?

কল্যাণের এই প্রশ্নে জয়া যেন বেঁচে গেল। সে যে কি বল্‌বে এতক্ষণ তা ঠিক করতেই পার্‌ছিল না। এবার সে বলে ফেল্লে—না, অসুখ কিছু করে-নি—এম্‌নিই—

তারপরে কল্যাণ কিছু বলবার আগেই সে আব্দার বল্লে—আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না।

জয়া বেঞ্চিটার মাঝখানে বসেছিল। তার পাশে যেটুকু জায়গা ছিল সেখানে নিঃসম্পর্কীয় কোনো পুরুষ বসলেও সম্ভ্রমতার ব্যবধান যথেষ্টই থাকে। তবুও কল্যাণ বেঞ্চিতে বসবার উপক্রম করতেই জয়া বেঞ্চির প্রায় আর এক কোণে সরে গেল।

বেঞ্চিতে বসেই কল্যাণ বল্লে—আপনার বোধ হয় এখানে একলাটি খুব কষ্ট হচ্ছে। আমার তো এক সপ্তাহেই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠেছে।

জয়া মৃদুস্বরে বল্লে—জায়গাটা আমার ভালোই লাগ্‌ছে।

কল্যাণ বল্লে—জায়গাটা তো খারাপ নয়, কিন্তু লোক জন না থাকলে আমি টেঁকতে পারি না। আপনি বোধ হয় নির্জ্জন-প্রিয় ?

জয়া একটু থেমে উত্তর দিলে—বেশী লোক-জনের মধ্যে থাকা আমার অভ্যেস নেই। সেইজন্যই বোধ হয় কোনো নির্জ্জন জায়গায় থাকতে আমার কষ্ট হয় না।

কল্যাণ এবার কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থেকে বল্লে—আমাদের এখানটাও কয়েকদিন পরে খুব সরগরম হোয়ে উঠ্‌বে। ছোট পিসিমা তাঁর তিনটি মেয়েকে নিয়ে আসচেন, তাঁর সঙ্গে লতিও আস্‌চে। সে তো একাই একশো। লতির সঙ্গে আপনার ভাব হয়েছে নিশ্চয় !

জয়া প্রায় দু-বছর এ বাড়ীতে চাকরী করচে। কিন্তু লতি বলে কোনো ব্যক্তির সঙ্গে তার আলাপ তো হয়ই-নি, এমন কি এ বাড়ীর সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ তাও সে জানে না। মনিব-বাড়ীর পারিবারিক কোনো কথার মধ্যে সে কখনো থাকে-নি অথবা থাকার চেষ্টাও করে-নি। মাতৃহীনা ইলা ও বেলা অনেক সময় তার কাছে তাদের সম্পর্কীয় অনেকের গল্প করেছে কিন্তু সে সব কথা সে শুনেছে মাত্র, তাদের সম্বন্ধে কখনো কোনো কৌতূহল প্রকাশ করে-নি। কল্যাণের কথা শুনে সে আগের মতনই ধীরে ধীরে উত্তর দিলে—না, তাঁর সঙ্গে আলাপ হবার সুযোগ হয়-নি।

কল্যাণ বলে উঠ্‌ল—কি আশ্চর্য্য ! এতদিন কি ছোট পিসি এখানে আসেন-নি ?

জয়া বল্লে—তিনি বার কয়েক এসেছিলেন কিন্তু তাঁর সঙ্গে মেয়েরা ছাড়া আর কেউ আসে-নি।

কল্যাণ প্রশ্ন করবার আর কিছু পাচ্ছিল না। ইতিপূর্ব্বে আরও কয়েকবার সে জয়ার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে আলাপ করবার চেষ্টা করেচে কিন্তু সে বরাবরই লক্ষ্য করেচে যে, জয়ার কথার মধ্যে তার প্রশ্নের জবাবের অতিরিক্ত এমন একটি কথাও থাকে না যার সূত্র ধরে ঘনিষ্টতার সীমানায় পৌছতে পারা যায়। আজও রাত্রে জয়াকে বাগানে একলা দেখে সে তার সঙ্গে গল্প করবার জন্য এসেছিল কিন্তু গল্প তো দূরের কথা, সে আর কথাই খুঁজে পাচ্ছিল না।

ভারতবর্ষে শাসন-সংস্কার তখনও প্রবর্ত্তিত হয়-নি। তাই নিয়ে চারিদিকে তুমুল আন্দোলন চলেছিল। সেদিন বিকেলে মধুপুরের অধিবাসীরা মিলে এই সম্পর্কে এক সভা আহ্বান করেছিল। এই সভায় কল্যাণকে কিছু বলতে হয়েছিল। সে আর কথা না পেয়ে জয়াকে জিজ্ঞাসা করলে—আজকের সভায় গিয়েছিলেন ?

জয়া ছোট্ট একটি উত্তর দিলে—না।

কল্যাণের প্রশ্নের ভাণ্ডার প্রায় শেষ হোয়ে এসেছিল। জয়ার এই উত্তরে তা একেবারে নিঃশেষ হোয়ে গেল। আর কিছুক্ষণ চুপ কোরে কল্যাণ বল্লে—আচ্ছা, আমি যাই।

জয়াকে কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়েই কল্যাণ উঠে বাড়ীর দিকে চলে গেল।

—ক্রমশ

আরণ্যক

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

'অরণ্যং গত্বাঽথ বহিঃকৃত্বেন্দ্রিয়ার্থান্ স্বাচ্ছরীরাদুপলভেতৈনম্'
—মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ, ৬।৮

ঘোরে ধূমাবতী ধরা !—মহা-ঘোরে নিঝুম সমাধি !
ঝঞ্ঝা ছোটে, বৃষ্টি পড়ে, সৃষ্টিভরা দৃষ্টিহীন আঁধি।
যুগব্যাপী নির্জ্জন স্বপন
ভেঙে দিল প্রথম তপন,
ধরিত্রীর প্রাণপদ্মে জননীর আত্মা ওঠে কাঁদি—
প্রাণ চায় নিরালা সমাধি।

পুষ্পদ কাননকুঞ্জে অরুণিম শ্যামলী ধরণী,
মানুষ এসেছে বিশ্বে !—জ্বলে বনে উৎসব-অরণি !
দিগ্বসনা মনাবির ঠোঁটে
নগ্ন মনু মত্ত হয়ে ওঠে,
সবিস্ময়ে দেখে চেয়ে নীলিমায় চন্দ্রক-তরণী—
মাতৃস্নেহে ফুলন্ত ধরণী।

নরনারী খেলা করে—কল্পনার জীবন্ত কবিতা,
ছন্দ-ভরা বসুন্ধরা নন্দনের আনন্দে দ্রবিতা।
নগরের পঙ্কধূলা উড়ে
চিত্ত কারু ফেলেনিকো জুড়ে,
ভাষাতীত ভাষা দিয়ে পূজা করে প্রভাত-সবিতা—
ছিল নর সরল কবিতা।

তারপরে বিস্মরণী !—অমানুষী আকাঙ্ক্ষার চিতা !
গাহিল সভ্যতা-শিবা জ্বালানিয়া শ্মশানের গীতা ।

চক্ষে লাগে জলার্দ্র শ্রাবণ,
বক্ষে জাগে উচ্চণ্ড রাবণ,

বন ছেড়ে গৃহে এসে পাতালেতে ডোবে চিত্ত-সীতা—
রক্তরাঙা বাসনার চিতা ।

ইষ্টক-অরণ্যে ঢুকে জন্তু যত বস্ত্রে ঢাকে দেহ,
সাজন্ত মুখোস মুখে, মর্ম্মে নাই একরতি লেহ ।

মন্ত্রতন্ত্র পড়ে যন্ত্রাসুর
শান্তিপুরে করে তন্দ্রা দূর,

বিশ্ববুকে অস্ত্র হেনে ভাঙে-চোরে তপোবন-গেহ,—
ছদ্মবেশে ঢাকে পশু-দেহ ।

প্রাসাদে ঘুমায় পশু । মানুষ যে,—পথের ধুলায় !
নরনারায়ণ এসে ধনিকের চামর ঢুলায় ।

বিজ্ঞান সে, কার ক্রীতদাস ?
কুবেরের ঘরে বারোমাস !

যে-তিমিরে সে-তিমিরে দীন কেঁদে দু-চোখ ফুলায়
আর মরে পথের ধূলায় ।

প্রেম হেথা ব্যাধিমাত্র । দয়া-ক্ষমা—জীবনের ভুল ।
বন্ধু ? সে তো স্বার্থে সখা । নারী শুধু মোরসুমি ফুল।

সমাজ তো দুর্ব্বলের তরে,
শাস্ত্র নিয়ে যারা বাঁচে-মরে ।

আমিত্ব-সংহিতা রচি' বলী হানে পৃথ্বীবুকে শূল—
'আমি' ছাড়া বিশ্বে সব ভুল !

ওরে এ সভ্যতা নিয়ে গাঁথি আর কত অশ্রুমালা ?
আক্রন্দিত আত্মা জানে আঁত্‌-ছেঁড়া কি বৃশ্চিক-জ্বালা !
পটে তুমি কি আঁকিছ কবি ?
এ যে দেখি মড়কের ছবি !
প'ড়ে আছে ইতিউতি টুটো-ফুটো লাখো অস্থি-ডালা—
দুঃখী তায় গাঁথে অশ্রুমালা ।

ওগো বটপত্রশায়ী ! ভাসো আজি রক্তের সাগরে !
মানুষের ঠাঁই কোথা ? যদি হেথা তোমাকে না-ধরে ?
উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্যোম ফুঁড়ে ছোটে,
ঈশ্বরকে নীচে রেখে ওঠে,
ত্রিভুবনে দাবি তার ! তাই কি গো তুমিও হাঘরে ?—
গরীবের রক্তের সাগরে ?

বসুধা-দ্রৌপদী ডাকে,—এস এস হে পার্থসারথী !
পঙ্গু আজি পাণ্ডবেয়, মিথ্যা তার আত্মার আরতি !
হৃদয়ের কুরুক্ষেত্র মাঝে
কৌরবের জয়বাদ্য বাজে,
অসুরের-হাড়ে-গড়া শঙ্খে তোলো জয়শ্রী-ভারতী !
লজ্জা রাখো, হে পার্থসারথী !

ধ্বংস কর ইন্দ্রপ্রস্থ—গড়া পুরী ময়দানবের—
আবার ফিরায়ে দাও লুপ্ত স্মৃতি আদিমানবের ।
ফিরে দাও প্রথম প্রভাত,
জীবনের নর্ম্মদা-প্রপাত,
শান্ত তপোবনে চাহি অনাহত মন্ত্র প্রণবের—
ভেঙে পুরী ময়দানবের ।

পঞ্জর-পিঞ্জরে আজি বর্ত্তমান ওঠে ফুকারিয়া,—
কোথা সেই রূপকথা ?—অতীতের স্মৃতি-জাগানিয়া !
আছে বটে অরণ্য-জাঙাল
নাই ধনী, নাইকো কাঙাল,—
নাই সভ্য বর্ব্বরতা বিবেকের নয়ন বাঁধিয়া—
বর্ত্তমান ওঠে ফুকারিয়া !

কে চায় কাপড়-পরা কলে-চলা নর-পুত্তলিকা ?—
মিঠে-মুখ তেঁত-বুক, চোরা ছোরা—হিংসাবহ্নিশিখা !
হে মানুষ, ধরণীর বুকে
জাগো ফের নগ্নতার সুখে,—
শিরে নগ্ন মহাকাশ, পদে নগ্ন পৃথ্বীর মৃত্তিকা,—
জ্যান্ত হও, যন্ত্র-পুত্তলিকা !

সহস্র শতাব্দী কাঁদে। হে মানুষ, খোলো আঁখিপাতা,
কঙ্কাল-মন্দিরে তোর হা হা করে হতাদরে ধাতা।
মরুভূমে খুঁজিয়া উদ্যান
মিথ্যে কর ভবিষ্যের ধ্যান !
দুর্ভিক্ষ চাহিছে তোরে, কুঞ্জে ব'সে মিথ্যা মালা গাঁথা।
বেলা যায়, খোলো আঁখিপাতা।

ফিরে চল বনে ফের।—বার্ত্তা আনে বাতাসের ভাষা !
মাটিতে সোনার পুঁথি লিখে যায় মেঠো-কবি চাষা।
এস্‌রাজ বাজে ঝরণায়,
কুহু-কেকা তাই শুনে গায়,
রূপবতী বসুমতী ;—রবি-শশী ঢালে ভালোবাসা—
—বনবাসী বাতাসের ভাষা।

হে মানুষ, কথা কও! সাধে আজ প্রকৃতির প্রাণ,
ইঁটের কোটর ভেঙে গাও ন্যাংটো নাগাদের গান!
ঝাটাইয়া ধুলো-কালি-ঝুলি,
ঝট্ ক'রে ঝটিকায় তুলি,
এস শুনি বনে বনে মর্ম্মরিত পল্লবের তান—
প্রাণে রেখে প্রকৃতির প্রাণ।

হে মানুষ, কথা কও! সাড়া চায় বিশ্বমানবতা!
বর্ত্তমানে মর্ত্ত্যে আনো অতীতের অমৃত বারতা।
দেখ্ তোর অন্তরের তলে
প্রথম দম্পতি ফের চলে!
অরণ্য ডাকিছে তোরে, ডাকে নদী, তরুপুষ্পলতা,
আর ডাকে বিশ্বমানবতা।

হে মানুষ, কথা কও! ধর ফের আনন্দ-গীতালি!
আদিম প্রেয়সী ডাকে,—চিত্তে তার বিনিদ্র মিতালি!
অন্ধকার গিরির কন্দর,
অগ্নিহোত্রী পড়ে না মন্তর!
সভ্যতার নাটে আজি ব্যাপ্ত সুধু জড়তা-নিদালি—
গাও ফের জাগন্ত গীতালি।

নীড়

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র

আলনার পাশে ঘরের কোণে সযত্নে রাখা ভাঙ্গা বেতের পুরোণ দোলনাটি।

দেয়ালের ব্র্যাকেটে অর্দ্ধ-সমাপ্ত কাঠিতে আটকান ছোট্ট সবুজ পশমের একটি মোজা।

আর এক দেয়ালে টাঙান সস্তা দুটি জাপানী চিক্।

ক'টি ফোঁটা অশ্রু, ভীরু একটু আশা আর একটুখানি স্বপ্ন ;—এই নিয়ে বোধ হয় মানুষের নীড়। অন্তত রবির তাই।

ওই ছোট্ট নীড়টুকুর ভেতর তার সমস্ত আশা-আকাঙ্খা বেশ কুলোয় ; এই সংসারটুকুকে ধরে' তার জীবন লতিয়ে ওঠে, বিকশিত হয় ; কখনো বা শুকিয়ে মরে।

বিলেতি ক্যালেণ্ডারের বিম্বাফলোষ্ঠী মেমের ছবির ওপর, দুটি জানলা পার হয়ে একটি সঙ্কুচিত প্রথম আলোর রেখা পড়ে' তার প্রভাত হয়। সেই আলোর রেখা ধীরে ধীরে সরে, তার পর কোন্ সময় অতি সন্তর্পণে ভাঁড়ার ঘরের জানালার চৌকাঠ পেরিয়ে অন্তর্ধান হয়। তার সন্ধ্যা ঘনায় কেরাসিন কাঠের ছোট্ট টেবিলের ওপর হ্যারিকেন লণ্ঠনের অনতি উজ্জ্বল আলোর চারিপাশে।

বাতাস না থাকলে কয়লার উনুন ধরানোর ধোঁয়া পথ না পেয়ে ঘরে এসে ঢোকে। রান্নাঘরের দিকে হেঁকে রবি হয় ত বলে, 'উনুন ধরিয়ে ভাঁড়ার ঘরের দরজাটা একটু ভেজিয়ে দেওয়া যায় না! এই ধোঁয়ার মধ্যে ঘরের ভেতর বসে থাকতে পারে মানুষ!'

যে উনুন ধরিয়েছে তার উত্তর দিতে নেই। তাড়াতাড়ি উঠে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে একটু হেসে মুখ ভেংচে চলে যায়, হয় ত চাপা গলায় বলে' যায়, 'একটু ধোঁয়া আর সহ্য হয় না, আমরা যে রাতদিন ওই ধোঁয়ার মধ্যে আছি!'

কলতলা থেকে দিদি ডেকে বলে, 'সন্ধ্যেবেলা ঘরের ভেতর কুণোর মত বসেই বা আছিস্ কেন, একটু হাওয়ায় বেড়িয়ে আয় না!'

'হ্যাঁ, হাওয়ায় বেড়িয়ে আসবে! চৌকাঠ পেরুলেই গড়ের মাঠ কিনা!'

হেসে জবাব দিয়ে রবি আবার টেবিলের ওপর ঝুঁকে বই পড়া সুরু করে।

লতা কোন্ ছুতোয় ঘরে ঢোকে। পেছন থেকে কাঁধটা একবার নেড়ে দিয়ে চাপা গলায় কৃত্রিম রাগের স্বরে ধমক দিয়ে বলে, 'হ্যাঁ যাও না, একটু বেড়িয়ে এস না! আফিস থেকে এসে শুধু বই আর বই!'

চেয়ারটা ঘুরিয়ে রবি খপ্ করে লতার পলাতক শাড়ীর আঁচলটা ধরে ফেলে। কিন্তু কথা কওয়া আর হয় না, পায়ের শব্দে চট্ করে ফিরে আঁচল ছেড়ে দিয়ে রবি নিবিষ্ট ভাবে বই-এর পাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে, লতা ঘোমটা টেনে ক্ষিপ্র পদে বেরিয়ে যায়।

দিদি ঘরে ঢুকে ঈষৎ হেসে বলেন, 'তোকে যা আনতে বলেছিলাম, এনেছিস্?'

বই-এর ওপর থেকে মুখ না তুলেই রবি বলে, 'ওসব বাপু, আমার মনে থাকে না!'

'হ্যাঁ মনে থাকে না, না আর কিছু! ও তোর চালাকী। বৌটা যে না খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে গেল!'

'কেন আমাদের বাড়ী কি ভাত-ডাল জোটে না!' বলে রবি লুকিয়ে একটু হাসে।

দিদি এবার হেসে ওঠেন, বলেন, 'তুই আর হাসাস্ নি বাপু! ভাত-ডালের কথা হচ্ছে?—অরুচিতে যে কিছু খেতে চায় না!'

রবি চুপ করে থাকে।

দিদি এবার বলেন, 'তোর নিজের আনতে লজ্জা হয়—টাকা দিয়ে যাস্ বাপু, আমিই না হয় আনিয়ে নেব।'

'তাই নিয়ো বাপু! যত সব ফ্যাসাদ্!'

'তাই ত!' বলে হেসে দিদি বেরিয়ে যান।

লতা আর একবার কোন্ ছুতোয় ঘরে এসে পেছন থেকে চিম্‌টি কেটে বলে যায়, 'তুমি ভারী অসভ্য!'

রবি মুখ ফেরাবার আগেই সে ঘর থেকে পালিয়ে যায়!

বাঁধা গতের মত জীবন সেই অতি-পরিচিত পথে অতি-অন্তরঙ্গ ক'টি পর্দ্দা নিয়েই ফিরে ফিরে আনাগোণা করে। নির্দ্দিষ্ট সীমাটুকুর বাইরে সে পা বাড়ায় না, এই অতি-চেনার পর্দ্দা একটুখানি সরিয়ে একবার উঁকি মারবার কল্পনাও তার নেই। তার পৃথিবী ওই নীড়টুকুর মাঝেই অতি নিকটে এসে চিরপরিচিত হয়ে তাকে ধরা দেয়। সে পৃথিবীর দিগন্তে অজানিত সুদূর ধূ ধূ করে না, তার প্রান্তে অতর্কিত বিস্ময় অপেক্ষা করে থাকে না।

সে পৃথিবী রান্নাঘরের রোয়াক পেরিয়ে শীর্ণ আঙ্গিনাতে এসে হাত-পা খেলায়। সে পৃথিবী সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে সাহেব-সদাগরের আফিস হয়ে আবার ঘুরে আসে।

এই পৃথিবীটুকুর জন্যেই সে তৈরী হয়েছে। একান্ত নিজস্ব করে এই পৃথিবীটুকু তাকে পাওয়াবার জন্যে কতকাল হতে কত আয়োজন কত সাধনা।

শিশুকাল থেকে যেন সে এরই জন্যে কামনা করে এসেছে। এই কামনা করতেই শুধু সে জানে।

ছেলেবেলা কাঁদলে পিসিমা সান্ত্বনা দিয়ে ভুলিয়েছে, 'বড় হলে রাঙাবৌ এনে দেব।"—সে রাঙাবৌ বারবার অলক্ষিত চরণে এসে তার কৈশোর স্বপ্নকে রঞ্জিত করে গেছে।

পড়তে না চাইলে দিদি ভয় দেখিয়েছে, 'লেখাপড়া না শিখলে বিয়ে হবে না—'

আলমারীর চিনে মাটির পুতুল দেখিয়ে মা বলেছেন, 'তোর ছেলে হলে খেলা করবে।'

অপরাধ করলে বাবা বিরক্ত হয়ে মাকে বলেছে, 'তোমার ও ছেলের কিছু হবে না; ওটা রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াবে।'

এই নিরাপদ নীড় নির্ম্মাণেই জীবনের চরম সার্থকতা এ-কথা তাকে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করতে হয়েছে।

তার কৈশোর-যৌবনের সমস্ত কল্পনা সেই রাঙাবৌ-এর অদৃশ্য অঞ্চল আঘাতেই আলোড়িত হয়েছে।

তাই সত্যিকারের শুভদৃষ্টির ক্ষণে সেই রাঙাবৌ সঙ্কুচিতা, আনত আঁখি কালো মেয়ের ছদ্মবেশে দেখা দিলেও তার চিনতে দেরী হয় নি।

তারপর এমনি করে দিন যায়,—অন্তরঙ্গ পরিচিত দিনগুলি। অত বেশী চেনা বলেই তারা যেন অত বেশী প্রিয়।

হয় ত কোন্ অজানিত দেশে মহা প্রলয়ের উন্মত্ত লীলার মাঝে রক্তাক্ত নিশাবসান হয়।

কিন্তু তাদের দিন আসে যায় শান্ত মৃদু চরণে গৃহ লক্ষীটির মত। তার চরণধ্বনিতে সেই পুরাতন পরিচিত সুরটিই ফিরে ফিরে বাজে, পুনরাবৃত্তির পরম মাধুর্য্যে সবকিছু সে পূর্ণ করে যায়। তার বেশ বদলায়, রূপ তার একই থাকে।

জীবনের অনেক রকম ব্যাখ্যা হয় ত আছে, অনেক সুরেই তাকে বাজান যায়, কত মানবের ভাষায় তার কত অনুবাদ! কিন্তু তারা এই একটি অর্থকেই ধরে থাকে, এই একটি বহু পুরাতন ছন্দে তাকে বেঁধে রাখে, সংসারের ছন্দ, সীমাহীন আকাশের অরূপ দেবতাকে একটি প্রিয় নামে ডাকার ছন্দ—পৃথিবীকে আঙ্গিনা করার ছন্দ। দেয়াল দিয়ে ঘিরে ছাদ দিয়ে ঢাকলে জীবনের আকাশ তার অর্থ হারায় কি না সে প্রশ্ন করবার কল্পনাও তাদের মনে ওঠে না।

তাদের ছাদের উপর দিয়ে আকাশের উচ্ছৃঙ্খল বায়ু গর্জ্জে যায়, তারা নিজেদের ছন্দে তার উত্তর দেয়।

দিদি বলেন, 'পশ্চিমের জান্‌লাটা বন্ধ কর নি বৌ, যাঃ রবির বই-খাতা ভিজে গেলে সে রেগে অনর্থ করবে।

লতা বলে, 'দিয়েছিলাম ত।'

'তা হলে বোধ হয় ছিট্‌কিনিটা ভেঙে গেছে, যাও যাও শীগ্‌গীর যাও, বড় ট্রাঙ্কটা জানলায় না হয় ঠেকা দিয়ে এস। কবে থেকে বলছি, ছিট্‌কিনিটা খারাপ হয়েছে, তা ওর কি গা আছে, খালি বই আর বই।'

আপাদমস্তক ভিজে কাপড়ের জল নেংড়াতে নেংড়াতে রবি বাড়ীতে ঢোকে। দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে একটু হাসে, দিদি বলেন, 'ভিজে এলি ত! কত দিন বলেছি ছাতি না নিয়ে বেরুস্ নি রবি, তা তোরা কি কথা শুনিস্? ছাতি নিলে তোদের যে অপমান হয়।'

লতা শুকনো কাপড় গামছা এগিয়ে দেয়।

দিদি বকে যান্, 'আর ঝড়-বৃষ্টি দেখলে মানুষের কি কোথাও দাঁড়াতে নেই। বৃষ্টিটা থামলেই না হয় আস্‌তিস্!'

গামছা দিয়ে গা মুছতে মুছতে রবি বলে, 'একটু ভিজলে আর কি হয়—বেশ ত মজা! ঘামাচি মরে যাবে।'

শুক্‌নো কাপড়টা সে পরতে যায়; দিদি রেগে বলেন, 'ওই তোর গা মোছা হ'ল! মাথায় যে একমাথা জল। মাথা মোছ্ ভাল করে আগে!'

রবি হেসে মাথার লম্বা চুলগুলোতে একবার গামছা সজোরে ঘসে বলে, 'নাও হ'ল ত!'

'না হ'ল না।—আর একটা শুক্‌নো গামছা নিয়ে এস ত বৌ, মাথায় অতখানি জল বসলে অসুখ করবে না?'

বাইরে উন্মত্ত বাতাস সমস্ত বাড়ীটিকে ঘিরে তুমুল কলরব করে। (পৃথিবীর কোন্ কূল হতে কোন্ কূলে চলে বিপুল মেঘের সমারোহ। নীড়ের ভাষায় তারা আকাশের উত্তর দেয়। সে নীড় শুধু ছাদ দিয়ে ঢাকা দেয়াল দিয়ে ঘেরা নয়—সে নীড় সৃষ্টিকে দেখবার একটি বিশেষ দৃষ্টি, জীবনকে অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করবার একটি বিশেষ ভঙ্গি)

* * * *

কিন্তু বিধাতা বোধ হয় পরিহাসের লোভ সংবরণ করতে পারেন না।

দুদিনের জরবিকারে হঠাৎ লতাকে হারিয়ে রবি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যায়। কোন্ তীক্ষ্ণ শাণিত অস্ত্রে কে যেন তার একটা প্রধান অঙ্গ পরিপাটি করে হঠাৎ কেটে বাদ দিয়েছে। সে অঙ্গ যে তার নেই এ উপলব্ধিই তার হতে চায় না, শুধু আঘাতের প্রচণ্ড বেদনাটি বিমূঢ় মনের মধ্যে সঞ্চরণ করে কি প্রশ্ন করে ফেরে যেন!

ছ'বৎসরের যে পরিচিত, ছ'বৎসর যে জীবনের প্রতি-মুহূর্ত্তের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিল, দু'দিনের পরে তার কোন চিহ্ন মেলে না। রবির ঘনমেঘাচ্ছন্ন মনের আকাশে কোথা থেকে অকস্মাৎ বেদনা গুমরে গুমরে ওঠে, সে বুঝতে পারে না। হঠাৎ বিদ্যুৎবিদারণের মত তীব্র বেদনার আলোকে সে এই নিদারুণ সর্ব্বনাশ ক্ষণিকের জন্য উপলব্ধি করে মাত্র, তারপর আবার সমস্ত অন্ধকার হয়ে আসে।

আগের দিন একটু ঝগড়া হয়েছিল। সামান্য ঝগড়া—অমন তাদের অনেক হয়েছে। লতা বলেছিল, 'তুমি আমার সঙ্গে কথা বোলো না। যাও।'

'বেশ বেশ' বলে রবি পাশ ফিরে শুয়েছিল।

তারপর রবি একবার ভাব করবার চেষ্টা করে। লতা তার হাতটাকে জোর করে ঠেলে দিয়ে বিছানা থেকে উঠে গিয়েছিল। চৌকীর কোণ লেগে হাতটা রবির একটু কেটে যায়।

'দেখ ত হাতটা কেটে দিলে ত!'

'কই দেখি!' বলে লতা এগিয়ে এসেছিল কিন্তু রবি তাকে ঠেলে দিয়ে বলেছিল, 'যাও, দেখতে হবে না!'

লতা অভিমানে মেজেতে গিয়ে চুপ করে সেই যে বসেছিল সারা রাত আর ওঠে নি।

পরদিন সকালেই একেবারে বিকারের প্রলাপ আরম্ভ হয়। তারপর দুটি দিন মাত্র। লতার একবার জ্ঞান পর্য্যন্ত হয় নি। রবি একবার একটু ক্ষমা ভিক্ষা করবার অবসরও পায় নি। কোন্ নির্ম্মম দেবতা দু'জনার ছ'বৎসরের নিবিড় পরিচয়ের মাঝে দুর্ভেদ্য আড়াল সৃজন করে রবিকে উপহাস করে। নীড়ের যে ছন্দ মানুষ কত কালের সাধনায় সার্থক করতে চায়, মৃত্যুর তার প্রতি কোন মমতা নেই।

পুরাতন নীড় তেমনই থাকে। পুরাতন অভ্যাসগুলি সহজে মরে না। ক্যালেণ্ডারের বিম্বাফলোষ্ঠী মেয়ের

ছবির ওপর আলো পড়ে, তেমনি প্রভাত হয়। তেমনি সন্ধ্যা ঘনায়, কেরাসিন কাঠের ছোট্ট টেবিলের ওপর হ্যারিকেনের আলোর চারি পাশে।

দিদি যেন কথা কইতে ভুলে গিয়েছেন। সারাদিনে ভাই-বোনের মধ্যে ছুটি একটি কথার বিনিময় হয় মাত্র। জীবনের বাঁধা গৎ তেমনিই অতিপরিচিত সুরের পথে আনাগোণা করে, কিন্তু যেন পঙ্গুর মত, বেসুরে।

আফিস থেকে তাড়াতাড়ি আর রবি বাড়ী ফেরে না। উন্মনা ভাবে ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে অনেক রাত্রে এসে শুয়ে পড়ে। দিদি কিছুই বলেন না।

প্রতিবেশিনীরা তাঁকে উপদেশ দেয়, 'কতই বা আর ওর বয়স, বৌ মরে গেল বলে কি আর বৈরিগী হয়ে থাকতে হবে—ভাল দেখে একটি বৌ করে দাও।'

দিদির কিন্তু কোন আগ্রহ দেখা যায় না।

রবি আফিসে গেলে শূন্য ঘর দোর খাঁ খাঁ করে। আকাশকে দেয়াল দিয়ে ঘিরে ছাদ দিয়ে ঢেকেও যেন যথেষ্ট ছোট করা যায় নি—বিপুল শূন্যতা ক্রমশ বেড়ে চলে।

দিদির শেষে অসহ্য হয়ে ওঠে। বলেন, 'পাড়ার ক'জন বদরিকা যাচ্ছে, যাব রে?' রবি বাধা দেয় না।

দিদি যাবার সময় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলে যান, 'তোর কিছু অসুবিধা হবে না ত? আমি খুব শীগ্‌গির ফিরে আসব। তোর ঘর-দোর ঝাঁট পাট, কাপড় কাচা, বাসন মাজা, লছমী সব করবে। আর বামুন ঠাকুরকেও বলে গেলাম।

তারপর মুখ ফিরিয়ে বলেন, 'একটু সময়ে খাস্‌দাস্।'

তারপর ঘর একেবারে শূন্য। রবি নিজের বেদনা বিশ্লেষণ করতে পারে না, চায়ও না। শুধু এইটুকু সে বোঝে যে, অভাব তার শুধু লতার নয়, লতার সঙ্গে জড়িয়ে সংসারের যে সুরটুকু ছিল সেই সুরটুকুর জন্য তার সমস্ত প্রাণ তৃষিত হয়ে আছে। লতার চেয়েও সেই সুরের অভাব যেন বেশী করে বাজে।

দিদি কিন্তু এক মাসের মধ্যেই ফিরে এলেন। বল্লেন, দূর্! বদরিকা সে কতদূর; আর কি হাঁটবার ক্ষমতা আছে। অনেক দিন শ্বশুর বাড়ী যাই নি, ভিটে মাটি সব উচ্ছন্নে গেছে, একবার দেখে এলাম। আর এই হতভাগী কিছুতেই ছাড়ল না, তা বল্লাম, 'চল্, আমার সঙ্গেই না হয় থাকবি।'

হতভাগী পিছনে সাদা থানে আপাদমস্তক ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। মাথার কাপড় একটু সরিয়ে রবির দিকে একবার চেয়েই চোখ নামাল। হতভাগী দিদির দেওরঝি, নাম কমল।

দিদি বলেন, 'শ্বশুর-কুল বাপের-কুল সব কুল খেয়েছে, হতভাগী না ত কি! দু'বছরে বাপ গেল আর চার বছরে মা। কোলে পিঠে করে আমিই মানুষ করে তের বছরে বিয়ে দিয়ে এসেছিলাম। আমার কপাল ভাঙ্গার পর এই বার বছর ত আর সেখানে পা দিই নি। গিয়ে শুনলুম হতভাগী বিয়ের এক বছর না পেরুতে পেরুতে শাঁখা সিঁদুর খুইয়ে এসেছে।'

হতভাগী কমল দিদির কাছেই থাকে।

কিন্তু প্রথম দিন থেকেই রবির মন এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

আপনাকে সে সহস্র বার ধিক্কার দেয়, নিজের মনকে কলুষিত বলে সে অত্যন্ত ঘৃণা করে কিন্তু তবু সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়, এই অপরিচিতা মেয়েটিকে হয় ত বেশী দিন সে নির্ব্বিকারভাবে মন থেকে দূরে ঠেলে রাখতে পারবে না। কমলকে পঁচিশ বছরের যুবতী নারী হিসাবে দেখবার একটা প্রবল প্রবণতা তার মনের যে আছে এ কথা সে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না।

দিদির ওপর তার রাগ হয়। মনে হয় দিদি বুঝি অতি সহজে লতাকে ভুলে গেছেন বা ভুলতে চান্। অযাচিত ভাবে এই বোঝা তার স্কন্ধে চাপানর জন্য সে সকলের ওপরই বিরক্ত হয়ে ওঠে।

প্রতিদিন যত তার মনে হয় যে, কমল বোধ হয় লতার চেয়েও পরিপাটী ভাবে সকল কাজ করে। সংসারের নানা খুঁটিনাটিতে যত সে কমলের অক্লান্ত পটু হাতের পরিচয় পায়, অকারণ বিদ্বেষ তার তত বেড়ে ওঠে।

কমলকে সুন্দরী বলা হয় ত চলে না কিন্তু তার মুখে

একটি উগ্র শ্রী আছে এবং তার কৃশ দেহে মনে হয় যৌবন ভরানদীর মত পরিপূর্ণ হতে না পেরে সঙ্কীর্ণ তীরের মাঝে বেগে প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে।

লজ্জা কমলের নেই কিন্তু তাকে বেহায়া বলাও চলে না। সেই প্রথম দিনের পর থেকে মুখের কাপড় সে খুলেই রাখে। অসঙ্কোচে সে চলা ফেরা করে বটে কিন্তু গায়ে পড়ে আলাপ করবার কোন চেষ্টা তার মাঝে রবি দেখতে পায় না। কিন্তু তবু রবির অসহ্য মনে হয়। লতার নির্দ্দিষ্ট কাজে আর একজনকে ব্যস্ত থাকতে দেখে তার মন আরো পীড়িত হয়ে ওঠে। তার মনে হয়, লতার অভাবে সংসারের পঙ্গু ছন্দকে ঠেকা দিয়ে সহজ ভাবে চালাতে গিয়ে সে যেন সমস্ত বিস্বাদ করে তুলেছে।

কিন্তু রবির বিরক্তি ক্রমশ ভয়ে পরিণত হয়। এখনও সে আফিস থেকে অনেক রাত্রে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফেরে। উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে এখনও সে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু একদিন হঠাৎ এইটুকু আবিষ্কার করে সে ভীত হয়ে ওঠে যে, উদ্দেশ্য-বিহীন ভাবে ঘোরার ভেতরে তার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য প্রবেশ করেছে। (আজকাল তাকে বাড়ী ফিরব না এই সঙ্কল্প বারবার স্মরণ করতে হয়। একদিন সে নিজের অজ্ঞাতে ঘুরে বেড়িয়েছে, আজকাল তাকে সচেতন ভাবে কর্ত্তব্য সাধনের মত বাড়ী ফেরার ইচ্ছাকে দমন করতে হয়।)

রাত্রে দিদির বদলে কমল এসে দরজা খুলে দেয়। খাবারের আয়োজন করে ডাকে, 'আসুন।'

কথাবার্ত্তা আর কিছু হয় না।

নীরবে রবি খেয়ে উঠে শুতে চলে যায়। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক রাত পর্য্যন্ত সে টের পায় কমল সংসারের কাজ করছে। সংসারের সকল কাজ সে-ই করে। কেমন ধীরে ধীরে যে কখন সংসারের সকল ভার এই মেয়েটি নিজের স্কন্ধে তুলে নিয়েছে কেউ বলতে পারে না।

তাদের যা-কিছু কথা হয় এই সংসারের সূত্রে। এবং সেই সামান্য কথাবার্ত্তার সুর কেমন ধীরে ধীরে বদলায় তা রবি বুঝতে পারে না এমন নয়।

বাজারের পয়সা দিয়ে কমল বলে, 'একটু চোখ দিয়ে দেখে বাজার করবেন, বুঝেছেন? কালকের বেগুনগুলো ত সব পোকা ধরা ছিল।'

রবি বলে, 'চোখ দিয়েই ত দেখি, তবে বেগুনের ভেতরকার পোকা দেখতে গেলে ত দিব্যদৃষ্টি দরকার—সে আর কোথায় পাব?'

কমল একটু হাসে, বলে, 'লোকে শুধু চোখেই পোকা-ধরা বেগুন চেনে, দিব্যদৃষ্টির দরকার হয় না।'

'আমি তা হলে চোখেও বোধ হয় কম দেখি।' বলে' রবি নিজের ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বেরিয়ে যায়। এই সামান্য হাস্যপরিহাসের চেষ্টাটুকু তাকে যেন হঠাৎ চাবুক মেরে সচেতন করে দেয়।

কিন্তু একেবারে গম্ভীর হয়ে থাকাও বোধ হয় যায় না। রবির মনে হয়, তা উচিতও বুঝি নয়। মনে হয় এই যে অনাত্মীয় মেয়েটি তার সংসারে সারাদিন প্রাণান্ত পরিশ্রম করে, দুবেলা দুমুঠি খেতে দেওয়াই কি তার যথেষ্ট প্রতিদান? তার নিজের মনের অন্যায় প্রবণতার জন্যে কি তার প্রতি অকারণে বিরূপ হয়ে তাকে অপমান করতে হ'বে! সামান্য একটু মিষ্ট ব্যবহারও কি তার প্রাপ্য নয়?

(এমনি করেই ব্যাপার এগোয়। কে যে কোন্ দিন কোন্ দিক থেকে ব্যবধান একটু করে সরায় তা রবি ভাল করে বোঝে না, কিন্তু আলাপ তাদের টুকরো টাক্‌রা কথা থেকে ক্রমশ দীর্ঘ হয়ে আসে) হাস্য পরিহাসের সুর আরো স্পষ্ট হয়!

হঠাৎ একদিন বিছানা পাত্‌তে পাত্‌তে কমল জিজ্ঞাসা করে, ' 'চোখের বালি' পড়েছেন?'

রবি টেবিলে বসে পড়তে পড়তে অন্যমনস্ক ভাবে বলে, 'হুঁ।'

কিন্তু পর মুহূর্ত্তে সে সচেতন হয়ে ওঠে। মুখ ফিরিয়ে দেখে কমল তার দিকে তখনও চেয়ে আছে।

দৃষ্টি নয়—সে যেন ক্ষুধিত আলিঙ্গন! রবি যেন কমলকে নূতন ভাবে অনুভব করে। মনে হয়, কমলের বক্র হাসির মধ্যে যেন একটু কঠিনতার আভাষ খেলে যায়। কিন্তু সে কঠিনতা শুধু রবির দিক হ'তে আঘাত পাবার আশঙ্কার ছদ্মবেশ। রবি আবার বই-এর দিকে চোখ ফেরায়.

কিন্তু পড়তে পারে না। কমলের দৃষ্টি যেন তার সমস্ত দেহের মধ্যে অসহ্য আনন্দের মত উন্মত্ত ভাবে সঞ্চরণ করে ফেরে, সর্ব্বাঙ্গের সমস্ত স্নায়ুতে যেন সে দৃষ্টির আলিঙ্গনে অশান্ত শিহরণ জাগে।

তারপর লতার স্মৃতির সম্মানার্থে রবি একবার শেষবার বিদ্রোহ করে। কিছুদিন হ'তে আবার সে আগেকার মত জীবনের নিয়মিত ধারায় ফিরে এসেছিল। আবার সে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠে। আফিস থেকে আবার সে গভীর রাত্রে বাড়ী ফেরে, কোন দিন আফিসে পর্য্যন্ত যায় না। কমলের সঙ্গে কথা সে একেবারে বন্ধ করে দেয় এবং তাকে সম্পূর্ণ ভাবে এড়িয়ে চলে। অবশ্য এড়াবার জন্যে বিশেষ চেষ্টাও তাকে করতে হয় না। কমল নিজেকেই একেবারে সরিয়ে নেয়। বাজারের পয়সা সে টেবিলের ওপর রেখে কাগজে বাজারের ফর্দ্দ ও সেই সঙ্গে রেখে দেয়। খাবারের আয়োজন করে দিয়ে সে সরে যায়। কিন্তু অকারণে কমলের এই ব্যবহারেও রবির রাগ হয়! কমলকে এড়াবার কোন অসুবিধা না থাকায় তাকে অপমান করবার অহেতুক ইচ্ছা তার মনে জাগে।

আলমারীতে অনেকগুলি পুতুল সাজান ছিল। সে পুতুল পুরুষানুক্রমে সেখানে সংগৃহীত হয়েছে এবং সেই পুতুল দেখিয়েই একদিন শৈশবে মা বলতেন, 'তোর বৌ এসে খেলা করবে।'

কমল আলমারী খুলে পুতুলগুলি নূতন করে ধূলো ঝেড়ে সাজিয়ে রাখছিল।

রবি ঘরে ঢুকে কমলকে দেখেই বেরিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু দরজার কাছে যেতে অপমান করবার একটা ছুতো তার মনে পড়ে গেল, ফিরে অত্যন্ত রূঢ় ভাবে বল্লে, 'ও-গুলো নাড়া চাড়া আমি পছন্দ করি না, এতে তার অপমান হয়।'

উত্তর হয় ত এ কথার ছিল। দিদি নিজে কমলকে সে-গুলি সাজাতে বলেছিলেন, এবং যত্ন করে গুছিয়ে রাখলে 'তার' কি করে অপমান হয় তাও বিচারের কথা।

কিন্তু উত্তর দিতে কমল পারে না, অপমানই যেখানে উদ্দেশ্য সেখানে উত্তরের কোন মূল্যই নেই এটুকু কমল বোঝে। নীরবে সে পুতুল সাজান থামিয়ে আলমারী বন্ধ করে দিলে, শুধু তার সমস্ত মুখ এই নির্ম্মম আঘাতে করুণ, পাংশু হয়ে উঠ্‌ল।

কমল ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কিন্তু তার সেই পাংশু কাতর মুখের অসহায় বেদনা রবির বুকে তীরের মত বিঁধ্‌ল।

এর পর কি হবে, এবং কি করা উচিত রবি কিছুই বুঝতে পারে না। কমলের মুখের দিকে চাইলে মনে হয় এই ক'দিনে সে যেন অত্যন্ত কাহিল হয়ে গেছে। একটি গাঢ় অবসন্ন বেদনার ছায়া তার মুখে লেগে থাকে।

রবির মন আর্দ্র হয়ে আসে এবং রবি মনে করে এ শুধু করুণায়। কিন্তু কি ভাবে সেদিনের রূঢ় আচরণের জন্যে ক্ষমা ভিক্ষা করলে তা করুণার সীমা ছাড়িয়ে না যায় তা সে ঠিক করতে পারে না। কিন্তু তাকে দ্বিধায় বেশী দিন থাকতে হয় না।

সেদিন সন্ধ্যায় রবি ইচ্ছা করেই ঘরে ছিল। আলো দিতে এসে কমল খপ্‌ করে রবির হাতটা ধরে ফেল্লে। তার মুখের দিকে চেয়ে রবি একেবারে বিস্মিত হয়ে গেল। কমলের চোখে জল! রবির হাত নিজের হাতের মুঠিতে ব্যাকুল ভাবে চেপে ধরে সে ধরা গলায় বল্লে, 'আমাকে ক্ষমা করুন।' সে কণ্ঠস্বরে সীমাহীন ব্যাকুলতা।

'ও কি করছ কমল!'

কিন্তু কমল হাত ছাড়ল না। সেই কোমল উষ্ণ হাতের স্পর্শ তীব্র সহানুভূতির স্রোতে রবির সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছিল, সে আনন্দ বেদনার চেয়ে যেন তীক্ষ্ণ।

কমল তেমনি বলে যাচ্ছিল, 'আমি সত্যিই নির্লজ্জ, আমি মনে মনে সত্যিই পাপী, আমি আবার দেশে চলে যাচ্ছি কিন্তু আমায় ক্ষমা করলেন বলুন!'

রবি ব্যাকুল ও শঙ্কিত হয়ে বল্লে, 'ও কি করছ! দিদি, পাশের ঘরে রয়েছেন শুনতে পাবেন যে!'

কিন্তু কমলের অশ্রু থামতে চায় না, বল্লে, 'আমি সত্যিই এবার দেশে যাব, আপনি শুধু ক্ষমা করলেই আমি অনেকটা শান্তিতে যেতে পারব।'

যা-কিছু অস্পষ্ট স্মৃতি, শিথিল সঙ্কল্প রবির মনে ছিল এই অশ্রুর প্লাবনে সে সমস্ত ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যায়।

অকস্মাৎ ব্যাগ্র বাহুতে কমলকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সে বল্লে, 'তোমায় কোথাও যে যেতে দিতে আমি পারব না কমল !'

সেই পুরাতন মামুলি নাটুকেপনা ! কিন্তু তারা সে কথা বুঝতে পারে না। আর মানুষের প্রবলতম অনুভূতির প্রকাশ বুঝি অমনি স্বাভাবিকতার সীমা ছাপিয়েই যায় !

শুধু দিদি বিরক্ত হয়ে ওঠেন। কমলের হাতে সংসার ছেড়ে দিয়ে তিনি যে পূজা ধর্ম্মের নিভৃতলোকে আপনাকে একেবারে নিমগ্ন করতে চেয়েছিলেন, সেখানেও এই সংসারের ধারা-পরিবর্ত্তনের সংবাদ পৌছায়।

কমল যেন একেবারে বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। তার এ নূতন রূপে রবি পর্য্যন্ত বিস্মিত হয়ে যায়। পিপাসিত শুষ্ক মরুর গাছ বহুদিন পরে পর্য্যাপ্ত জল পেলে বুঝি এমনিই হয়। শুধু তার রূপে নয়, তার দেহের প্রতি ভঙ্গিতে গতিতে এই নূতন সজীবতার প্রকাশ উচ্ছল হয়ে ওঠে। কোন বিধিনিষেধ সে মানতে চায় না এমন নয়, কোন বিধি তার মনেই পড়ে না।

রবিকে ভাত দিতে দিতে সে সামান্য কারণে খিল খিল করে হেসে ওঠে। দিদি ঘর থেকে তিক্ত তীব্র কণ্ঠে বলেন, 'ওকি বেহায়াপণা হচ্ছে কমল ?'

রবি লজ্জায় ঘৃণায় এতটুকু হয়ে যায়, কিন্তু কমলের মুখে তার কোন আভাষই দেখা যায় না। রবির হাতে একটা চিম্‌টি কেটে সে হাসি থামাবার জন্যে নিজের মুখে কাপড় গুঁজে দেয়।

রবির দিক থেকে অনুরাগের প্রতিদান পাবার পরের দিন হ'তে সে যেন অন্য মানুষ হয়ে গেছে। তার সমস্ত আচরণের কথায় হাসিতে আনন্দের এমন একটি আতিশয্য প্রকাশ পায় যে, রবি বিস্মিত হয়ে লতার সঙ্গে তার তুলনা না করে পারে না। লতার সমস্ত আনন্দ উচ্ছ্বাসের মধ্যে কোথায় একটি সংযম ছিল। সে যেন ছিল শান্ত কোন নদীটির মত, কিন্তু কমল যেন উচ্ছৃঙ্খল ঝরণা, যেমন খেয়ালী তেমনি উদ্দাম !

তাদের দুজনার এই সম্বন্ধের মধ্যে যে হীন গোপনতা আছে তা অনবরত রবিকে পীড়িত করে। বাহিরের লোকের কাছে এই সম্বন্ধ যে কতদুর গর্হিত ও লজ্জাকর, সেই উপলব্ধি তার পরম আনন্দের মুহূর্ত্তগুলিকেও গ্লানিতে বিযাক্ত করে দেয়। কিন্তু কমল যেন কিছু বুঝতেই পারে না। যখন তখন সামান্য সুবিধা পেলেই সে আদরের আতিশয্যে রবিকে অস্থির করে দেয়। তার পঁচিশ বৎসর বয়সের আড়াল থেকে বঞ্চিতা তার পনর বৎসরের বালিকা-জীবনটিও যেন এ আনন্দের সমস্ত স্বাদ গ্রহণ করতে চায়। বালিকার মত সে অশান্ত উদ্দাম হয়ে ওঠে।

আফিস যাবার সময়। রবি তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে চুল আঁচড়ায়। হঠাৎ জল দেবার ছুতোয় ঘরে ঢুকে গলা ধরে ঝুলে পড়ে কমল বলে, 'আচ্ছা দেখব কেমন জোর—কতক্ষণ থাকতে পার ?'

এই মধুর ভাঁর ঘাড় হতে নামাবার দুর্ব্বল চেষ্টা করে রবি বলে, 'ছাড় ছাড়, বেলা হয়ে গেছে।'

পা দুটি কুঁচ্‌কে ঝুলোতে ঝুলোতে কমল বলে, 'ছাড়ব না, আমায় আফিসে নিয়ে চল।'—হাসিতে তার সমস্ত মুখ চোখ অপূর্ব্ব হয়ে ওঠে।

রবি কৃত্রিম রাগের স্বরে বলে, 'যাও, ন্যাকামি কোরো না।'

অত্যন্ত আবদারের ভাণ করে কমল বলে, 'ন্যাকামি যে ভাল লাগে।'

দুজনেই হেসে ওঠে, কিন্তু কমলের হাসি একেবারে অবাধ সঙ্কোচহীন।

'কিন্তু এ সব কি ইতুরে কাণ্ড শুনি, এটা গেরস্ত বাড়ী, না কি ?'

বজ্রাহতের মত চম্‌কে ফিরে রবি দেখে দিদি দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।—তাঁর মুখ রাগে আরক্ত হয়ে উঠেছে।

সে আর দাঁড়ায় না। এই পরম লজ্জাকর অবস্থা থেকে কোন মতে পালিয়ে সে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। কমল একা এই সমস্ত অপরাধের শাস্তি কি ভাবে গ্রহণ করবে সে কথা সে ভাববারই অবসর পায় না। কিন্তু আফিস থেকে ফিরবার সময় তার পা আর বাড়ীর দিকে উঠতে চায় না।

অনেক রাত্রে অবশেষে মরিয়া হয়েই সে বাড়ীতে ঢোকে। কমলের অবস্থা ভেবেই সে আরো শঙ্কিত হয়ে ওঠে। এই নিদারুণ অপমানে, এই গ্লানিতে শেষে সে যদি ভয়ঙ্কর কিছু করে বসে!

দিদি এসে দরজা খুলে দেন। কোন দিকে কমলকে দেখা যায় না। অথচ জিজ্ঞাসা করবার কোন উপায়ই নাই। আজকের সব কাজ দিদি নিজেই করেন। নতমুখে কোন মতে আহার সেরে রবি যখন নিজের ঘরে যায় তখন তার মন একেবারে ভেঙে পড়েছে।

কিন্তু টেবিলের ওপরই চিঠিটি মেলা। কমল পেন্সিলে দ্রুত হাতে লিখে গেছে,—'ঘুমিও না রাত্রে, উত্তরের জানলায় শব্দ করলে বেরিয়ে এসো।'

রাত্রে সেদিন অনেক কথাই হয়। কমল রবির বুকে মুখ গুঁজে একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে ওঠে। বলে, 'বল তুমি আমায় কিছুতেই ছেড়ে দেবে না!'

এই অসহায় কান্না, এই ব্যাকুল মিনতি, ভীরু পাখীর মত বক্ষ-নিবদ্ধ এই কোমল উষ্ণ নারীদেহ—সমস্ত মিলে রবির মনে যেন অভূতপূর্ব্ব তীব্র নেশা ধরিয়ে দেয়। সে একটা প্রকাণ্ড শপথ করে বসে।

কমল আবার বলে, 'সেদিন তোমাকে ছেড়ে কি বলে দেশে যেতে চেয়েছিলাম ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই!'

খানিক থেমে আবার, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলে, 'কিন্তু কেন এমন হ'ল? যদি এখানে না আসতাম!'

রাত্রির অন্ধকারে তারকালোকের স্নিগ্ধ মাদকতায় বুঝি অনেক কথাই বলা চলে, দিনের বেলা সূর্য্যের প্রখর আলোকে সে কথা হয় ত নিজের বর্ণ-বাহুল্যে লজ্জিত হয়। কোন্ পৃথিবী সত্য তাই বা কে জানে—রাত্রির, না দিনের!

তাদের ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য স্থিরও হয়ে যায়। সে কর্ত্তব্য অসাধারণ। কিন্তু কমলের স্পন্দিত বক্ষের ধ্বনি নিজের সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করতে করতে রবির সে কথা মনে হয় না।

কমল বলে, 'তুমি এবার বিয়ে করতে রাজী না হলে দিদি নিশ্চয়ই আমাকে নিয়ে তীর্থ বাস করবার কথা বলবেন দেখো। আজ সারাদিন আমায় সেই কথা বলেছেন আর বকেছেন।' তারপর একটু থেমে চোখের জল আঁচলে মুছে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে, 'কিন্তু তুমি শেষকালে পেছিয়ে যাবে না ত, ভাববে হয় ত থাক্ গে, আপদ তীর্থেই বিদায় হোক, কেমন!'

রবি উত্তরে আরো একটু নিবিড় ভাবে তাকে বুকে চেপে ধরে মাত্র।

কমল আবার বলে, 'আচ্ছা আমরা যেতে যেতে লুকিয়ে নেবে গেলে দিদি একলা রেলে যেতে পারবেন ত অতদূর, ভয় ত নেই কিছু?'

'সে বন্দোবস্ত আমি করব 'খন, তোমায় ভাবতে হবে না।'

পরম নির্ভরতার সঙ্গে রবির গলাটি আঁকড়ে ধরে কমল বলে, 'আমার কিন্তু সব যেন অদ্ভুত লাগছে, সত্যি স্বপ্ন মনে হচ্ছে না তোমার?'

পরের দিন সকালে অতৃপ্ত ঘুমের চোখে উঠে রবির সত্যই সব স্বপ্ন বলে মনে হয়। দিদি সকালেই কথাটা পাড়লেন। ঘরে ঢুকে একেবারে কোন প্রকার ভূমিকা না করে বল্লেন, 'আমি সম্বন্ধ করেছি, তোকে এবার বিয়ে করতে হবে।'

রবি চুপ করে রইল।

দিদি বল্লেন, 'চুপ করে থাকলে চলবে না, এই মাসটা পেরুলেই আমি বৌ আনব। মেয়েটি দেখতে শুনতে ভাল, তুই না হয় নিজেই একবার দেখে আসিস্।'

এ লজ্জা রাখবার জায়গা নেই। কালকের ব্যাপারের সঙ্গে এই বিবাহের প্রস্তাবের সম্বন্ধের জন্যই এ প্রস্তাব তার কাছে আরো অসহ্য বলে মনে হয়।

'আমি বিয়ে করব না!'

দিদি এবার আগুন হয়ে বল্লেন, 'তবে যা খুশী কর, আমি এ সংসারে আর থাকব না, আমাদের কাশী রেখে এস।'

রবি চুপ করে রইল।

দিদি আরো ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লেন, 'আমি আর একদিনও কিন্তু থাকব না, কালই আমায় রেখে আসতে হবে।'

কর্ত্তব্য, সঙ্কল্প সমস্তই স্থির। দিদিকে পাঠিয়ে সে

কমলকে নিয়ে অন্য কোথাও থাকবে। কাশীতে একজন আত্মীয় তাদের থাকেন, আগে থাকতে তাঁকে টেলিগ্রাম করে দিদি যাচ্ছেন জানিয়ে রবি সঙ্কল্প করেছিল মাঝ-পথে কোন ছুতোয় কমলকে নিয়ে নেমে যাবে। তারপর নতুন সংসার, কমলকে নিয়ে নূতন জীবন! নামবার ছুতোটা অবশ্য যে কি হবে সে এখনও স্থির করে নি এবং কমলের সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনটা কোথায় কি ভাবে আরম্ভ হবে তাও অবশ্য সে রাত্রে সে ভাল করে ভেবে দেখে নি, তবে মোটামুটি ভবিষ্যৎ জীবনের খসড়া তার ঠিকই ছিল।

কিন্তু আগের রাত্রের অনিদ্রায় ও সারাদিনের পরিশ্রমে অত্যন্ত মাথাধরা অবস্থায় আফিস থেকে বেরিয়ে সমস্ত সঙ্কল্প তার অত্যন্ত আজগুবি বলে মনে হ'ল।

তার গৃহ তার নীড়, সে নীড়ের পুরাতন নিত্য মধুর ছন্দ; সে নীড়ের সহস্র স্মৃতি, এই সবের সঙ্গে তার জীবন একান্ত ভাবে জড়িত, তার মনের সমস্ত নিরাপদ নোঙর উপ্‌ড়ে কে যেন তাকে উন্মত্ত সাগরের দুর্য্যোগের মধ্যে ঠেলে দিতে চায়; সেখানে সুখ শান্তি আনন্দকে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে জয় করে রাখতে হয় কিন্তু সে শক্তি ও সাহস তার কোন কালেই ছিল না। আর আনন্দের তীব্রতাও যেন তার সহ্য হয় না।

লতাকেও সে ভালবেসেছিল, কিন্তু সে ভালবাসা এখন উগ্র নয়, নীড়ের শান্ত নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার সঙ্গে সে ভালবাসা অনায়াসে মিশে গেছে। কিন্তু রবির মনে হয় কমলের ভালবাসাও যেন কোনদিন সে সম্পূর্ণভাবে ভালবাসতে পারে নি। সে ভালবাসা উগ্র প্রচণ্ড বন্যার মত, সে ভালবাসা সংসারের ছন্দে আপনাকে মিলিয়ে দেয় না, জীবনের একটু মধুর ব্যাখ্যাকে বাঁচিয়ে চলে না, সে ভালবাসা মানুষের সবকিছু দাবী করে,—সর্ব্বগ্রাসী দুরন্ত সে প্রেম। এই আতিশয্যটি রবির সংস্কারের বিরোধী। কমলের প্রতি আচরণে, তার আদরে তার সোহাগে এই আতিশয্য, এই উচ্ছলতা রবিকে বরাবর উদ্‌ভ্রান্ত করে দিয়েছে। কমলের আনন্দ বেদনার মত তীব্র। সেই প্রেমকে সম্বল করে নোঙর ছিঁড়ে জীবনের দুর্য্যোগের মাঝে নিরাশ্রয় হয়ে বেরিয়ে পড়তে হঠাৎ রবি ভয়ে শিউরে ওঠে। তার জীবনের সমস্ত শিক্ষা সমস্ত সংস্কার সমস্ত কল্পনা এর বিরোধী। লতার স্মৃতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার কথা আর তার মনে ওঠে না, কিন্তু এ যে একেবারে জীবনকে গ্রহণ করবার ভঙ্গিটি পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন।

কমলের সঙ্গে আর যাই হোক, নীড় রচনা করা যে যাবে না এ কথা রবি বোঝে। আত্মীয় স্বজনকে এড়িয়ে অত্যন্ত লজ্জাকর গোপনতার মাঝে এই যে গৃহ তারা পাতবে, সে গৃহ কিছুতেই নীড় হয়ে উঠ্‌তে পারে না; তার নিজের বর্ত্তমান গৃহ শুধু ত ইট কাঠ পাথরের নয়, তার পেছনে কত স্মৃতি, তার কতদিনের কত অভ্যাস এবং তার চেয়ে ত বেশী,—পৃথিবীকে আঙিনা করার সে একটি বিশেষ ছন্দ! কমলের সঙ্গে জড়িত জীবনে নোঙর ছেঁড়ার দুঃসাহসিকতার মাঝে দুর্ল্লভ আনন্দ হয় ত আছে কিন্তু দুর্ল্লভ আনন্দের প্রতি কোন লোভ তার নেই এবং দুঃসাহস আর যার থাক তার নেই। জীবনের পুরাতন ধারাটি ফিরে পাবার জন্যে তার সমস্ত প্রাণ লালায়িত হয়ে ওঠে। সে বুঝতে পারে, লতাকে সে ভালোবাসে নি, কমলকে সে ভালবাসে না, সে ভালবাসে শুধু তার কৈশোর স্বপ্নের সেই রাঙাবৌকে। সে রাঙাবৌ একান্ত অন্তরঙ্গ অতি-পরিচিত একটি সুরের অন্তর-লক্ষ্মী। তাকে পরিত্যাগ করে লক্ষ্মী-ছাড়া হবার সাহস, শক্তি বা ইচ্ছা কিছুই তার নেই।

রাত্রে বাড়ী ফিরে অসুখের ছুতোয় কিছু না খেয়েই রবি শুয়ে পড়ল। বালিশের তলায় কমলের চিঠিতে লেখা ছিল, 'আজ আবার তেমনি এস, লক্ষ্মীটি, ঘুমিয়ে পোড়ো না, ও জানালার কাছে নইলে দাঁড়িয়ে ডাকতে আমার বড় ভয় করে।'

কিন্তু রবি সেদিন উঠ্‌ল না। ভীত কমল বুকের অস্থির স্পন্দন নিয়ে ব্যাকুল ভাবে বার বার সে জানালায় আঘাত করে কি গভীর হতাশা নিয়ে ফিরে গেল তা সে জানতেও পারলে না। সে তখন নিজের সঙ্কল্প স্থির করে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

সকালে দিদি ঘরে ঢুকে গম্ভীর মুখে বল্লেন, 'আজ আর আফিস যেয়ো না তাহলে, আমি যাবই মনে থাকে যেন!'

রবি বিছানার উপর উঠে বসে মুখে হাসি টেনে বল্লে, না, তোমায় যেতে হবে না।'

'তার মানে?'

'তার মানে তুমি যা খুশী করো, আমার আপত্তি নেই।' বলে রবি উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কমল তখন যাবার উদ্যোগে বাক্স-পেঁটরা গুছোতে গুছোতে একটি ছোট্ট বহু-পুরাতন লুকান আর্শিতে গোপনে নিজের মুখ দেখছিল।

যদি কোন দিন—

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

যদি কোনদিন বেদনার মত বাদল ঘনায়ে আসে,
কাজল আকাশে আমার আঁখির সজল কাকুতি ভাসে ;
বসিয়া তাহার বামে,
একবার শুধু ভুল করে' তারে ডাকিয়ো আমার নামে।
আমার দেশের ব্যথিত পবন যদি কভু যায় ভেসে',
আদরের মত লুটায় তোমার লুলিত আকুল কেশে ;
গুণ্ঠন খুলে' দেখে নেয় যদি মুখখানি কমনীয়,
আমারি সোহাগ,—ভেবে তারে, সখি, কণ্ঠ জড়াতে দিয়ো!
যখন ফুরাবে কথা,
আমারি লাগিয়া অনুভব ক'রো একটু নির্জ্জনতা!
যদি কোন রাতে ঘুম ভেঙে যায়, চাঁদ জাগে বাতায়নে,
আমিও জাগিয়া দেখিতেছি চাঁদ,—সে কথা করিয়ো মনে।
দিবা যবে অবসান,
মোরে ভেবে চোখে আঁকিয়ো একটি অতৃপ্ত অভিমান!
মহুয়া-মদির মিলনের মোহে ভুলিয়ো আমার কথা,
উৎসব-শেষে বাজে যেন বুকে মধুর অপূর্ণতা!
যখন নিভিবে আলো,
ভেবো সেই নীল নিবিড় তিমির লাগিত আমার ভালো॥

যাদুঘর

উপন্যাস

শ্রীনরেন্দ্র দেব

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১৭)

—হ্যাগা, আমার অক্ষয় কবি না কি শুনছি আবার একটা বিয়ে করবার জন্য ক্ষেপেছে ?

মণিকার প্রশ্ন শুনে বিজয় হেসে উঠে বল্লে—হাঁ, ক্ষেপেছিল বটে, কিন্তু তার সে পাগলামী আজকাল সেরে গেছে !

—কি ক'রে সারলো গা ? তোমরা বুঝি তাকে পাগ্‌লা কালীর বালা পরিয়ে দিয়েছিলে ?

—না, আমাদের কিছু করতে হয় নি।

—তবে ? ... ওঃ বুঝিছি, তোমাদের প্রিয়ধনের ব্যাপার দেখে বুঝি বুড়োর চৈতন্য হয়েছে ?

—পাগল হয়েছো ? তাতে বরং ওর আরও উৎসাহ হয়েছিল !

—কী সর্ব্বনাশ ! তবে ? কিসে ও বুড়োর রোগ ভাল হ'ল ! লাঠ্যৌষধিতে না কি ?

বিজয় আরও হেসে উঠে বল্লে—প্রায় ! লাঠ্যৌষধিই বটে ! ওকে বাড়ীওয়ালা অসচ্চরিত্রের লোক বলে সে বাড়ী থেকে তুলে দিয়েছে !

—ঠিক করেছে ! তোমার বন্ধুবান্ধবগুলো সব অসচ্চরিত্র !

—না, তোমার অক্ষয় কবির সম্বন্ধে আর এই বিজয় স্বামীর সম্বন্ধে ও কথা বলা চলবে না ! দলের মধ্যে আমরা দু'জনই সচ্চরিত্র !

—যাও, যাও, বুড়ো বয়েস পর্য্যন্ত যে লোক পরস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম ক'রে বেড়ায় সে আবার সচ্চরিত্র ! তার চেয়ে বরং তোমাদের ওই কেশব, কনক চাটুজ্জে, হেমদাস—এরা ঢের ভালো, কারণ ওরা 'বাজারের বেশ্যা নিয়ে আমোদ করে—গৃহস্থের বউ-ঝি'র উপর নজর দেয় না ! আসল চরিত্রহীন হচ্ছে তোমাদের ঐ অক্ষয় বুড়ো—

—দেখো, অক্ষয়কে বুড়ো-বুড়ো কোরো না—তাহ'লে আমাদেরও গায়ে লাগবে ! দেখতে ও প্রবীণ হ'লে কি হবে, আমাদের মধ্যে যদি কেউ তরুণ থাকে তবে সে ওই তোমার অক্ষয় কবি !

—পোড়াকপাল আর কি ? ওকে বাড়ী থেকে যে উঠিয়ে দিয়েছে, বেশ করেছে। একটা কচি মেয়ের মাথা খেতে বসেছিল !

—উঠিয়ে তো দিয়েছে, কিন্তু সে যে আমাদের পাড়ায় এসে বাড়ী ভাড়া করেছে ! এইবার যে আমার মাথা খেতে বসবে !

—ভয় নেই, সে পথ বন্ধ করে দিয়েছি।

—কি করে ?

—সেদিন আমার কাছে এসেছিল প্রেম নিবেদন করতে এবং কি একটা উপহারও এনেছিল, আমি কিন্তু তার সঙ্গে দেখা করি নি আর তার উপহারও নিই নি !

—তাতে আর কি হয়েছে ? আর এক দিন আসবে দিতে—

—না, আর আসবে না। আমাকে একখানা চার পাতা চিঠি লিখেছে,—বুড়োর অভিমান হয়েছে !

—ভাগ্যিস্ ওই অভিমানটুকু অক্ষয়দা'র আছে, নইলে কি রক্ষা ছিল ?

—আচ্ছা, তুমি কেশবের আড্ডায় যাওয়া বন্ধ করতে পারো না?

—কেন বল তো?

—ওদের সঙ্গ যে বড় খারাপ! ওরা সব চরিত্রহীন, লম্পট, মাতাল—

মণিকার কথায় বাধা দিয়ে বিজয় বল্‌লে—কে তোমাকে এ সব বলেছে?

মণিকা বল্‌লে—অনেকের কাছেই ওদের নিন্দে শুনি! তুমি ওদের সঙ্গে বেড়াও বলে তোমাকেও সবাই মন্দ ভাবে, আমার তাতে ভারী মনে কষ্ট হয়!

—কেন, সবাই তো জানে আমি মদ খাই নি, বেশ্যা বাড়ী যাই নি—

অধৈর্য্য হ'য়ে মণিকা বললে—সে না হয় আমরা ক'জন জানি, যারা সদা সর্ব্বদা তোমার সঙ্গে আছি, তোমাকে নিত্য দেখছি কিন্তু বাইরের লোক তো সে সুযোগ পায় না! তারা তোমার সঙ্গীদের সংবাদ পেয়েই তোমার সম্বন্ধেও সেই একই ধারণা করে নেয়!

—তা যদি করে মণিকা, তাহ'লে তাদের তুমি খুব বেশী দোষ দিতে পারো না, কারণ ইংরিজীতে একটা কথা আছে যে, 'A man is known by the company he keeps.' আমার হাতে যদি প্রায়ই লোকে হুঁকো দেখে তা হ'লে এ কথা তারা অবশ্যই মনে করতে পারে যে আমি তামাক খেতে শিখেছি!

—তাই ত বল্‌ছি যে, তুমি ওদের সঙ্গ ত্যাগ করো, ওদের আড্ডায় আর যেও না।

—বারে! এ যে তোমার অন্যায় কথা মণি! আমার ভা'য়ের যদি কোনও দোষ দেখি তা হ'লে কি তাকে ত্যাগ করবো? আমরা যে সব ভা'য়ের মতন গো! ছেলেবেলা থেকে এক সঙ্গে একই স্কুলে পড়েছি, একত্রে খেলাধূলো করেছি, এক সঙ্গে বড় হ'য়েছি! সুখে দুঃখে আপদে বিপদে পরস্পর পরস্পরের জন্যে আমরা একটা আন্তরিক সহানুভূতি অনুভব করি।

মণিকা হেসে উঠে বললে—আমি এইটে ভেবে আশ্চর্য্য হই যে, এতগুলি লক্ষ্মীছাড়া লোক এক সঙ্গে জুটলো কেমন করে?

বিজয় এ কথায় ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে বললে—সবাই তো' লক্ষ্মীছাড়া নয়, আমরা দু'চার জন বটে ওই বিশেষণে বিভূষিত হবার যোগ্য কিন্তু কেশব দ্বিজেন এদের তো তুমি ও কথা বলতে পারো না মণি! কেশব আমাদের দলের মধ্যে সকলের চেয়ে অবস্থাপন্ন! তার বাপ বেশ মোটা আয়ের বিষয় সম্পত্তি রেখে গেছেন এবং তাঁর লোহার সিন্ধুকটাও নগদ টাকা থেকে নিতান্ত বঞ্চিত ছিল না। কেশব বি-এ পাশ করেছে, কিন্তু তা বলে সে তার বাপের সোনা-রূপার লাভজনক কারবারটা তুলে দেয় নি, নিজেই চালাচ্ছে। সকাল থেকে রাত্রি পর্য্যন্ত নিয়মিত দোকানে গিয়ে বসে এবং খাটে। সৌভাগ্য ও লক্ষ্মীশ্রী নিয়েই তার জন্ম বলে তার কারবারও উত্তরোত্তর ফেঁপে উঠেছে।

—তবে মদ খায় কেন?

—ওকে তুমি মদ খাওয়া বলতে পারো না! ন'মাসে ছ'মাসে কখনও কদাচ বন্ধু-বান্ধবের একান্ত অনুরোধে উপরোধে এক আধ পাত্র খায় বটে, তা ব'লে সে মাতাল নয়।

—কিন্তু তার চরিত্রও ত ভাল নয়।

—ওই একটিমাত্র দুর্ব্বলতা যে তার আছে এ কথা আমি অস্বীকার করতে পারবো না। কিন্তু দেখো, এ সম্বন্ধে তাদের মত সম্পূর্ণ অন্য রকম; তোমার আমার নীতি-জ্ঞানের সঙ্গে তা একেবারেই মিলবে না; ওরা বেশ্যালয়ে যাওয়াটাকে পুরুষের পক্ষে মোটেই অন্যায় বলে মনে করে না। ওটাকে ওরা শরীরের প্রয়োজন হিসেবে ধরে! এই তুমি যা একটু আগে বলছিলে আর কি? ওরাও বলে কুললক্ষ্মীদের সম্মান রক্ষা ক'রে যে মানুষ চলতে না পারে সেই দুশ্চরিত্র! মদ খেলে, কি বেশ্যালয়ে গেলেই চরিত্রহীন হয় না যদি না সে তার মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দেয়! শিক্ষায় দীক্ষায় দয়া দাক্ষিণ্যে ঔদার্য্যে মহত্বে ওরা কারুর চেয়েই ছোট নয়—ওই যে আমাদের দ্বিজেন, ও ছোকরা মনে করো—

বাধা দিয়ে মণিকা বললে—ছি ছি, ও মিন্সের কথা আর লোকালয়ে বোলো না, শুন্‌লুম ও-নাকি ওর ছেলের সেই আয়াটার সঙ্গে জুটে গেছে—

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হ'য়ে বিজয় বললে—দেখো, এইগুলো

তোমাদের কিন্তু ভারী অন্যায়, লোকের নামে অপবাদ দিতে তোমরা একেবারে সতত তৎপর! কিছু জানো না, শোনো না, অমনি একটা কুৎসা রটালেই হলো! সে মেয়েটি আয়া নয় মোটেই, তোমাদেরই মতো একজন ভদ্রমহিলা, দৈব-দুর্ব্বিপাকে সমাজচ্যুতা হয়েছিল, দ্বিজেন সেই নিরুপায় মেয়েটিকে পথে দাঁড়াবার দুর্ভাগ্য থেকে বাঁচিয়ে সসম্মানে নিজের গৃহে আশ্রয় দিয়েছে ব'লেই অমনি তাদের নামে একটা কলঙ্ক রটাতে হবে?

মণিকা বললে—কে জানে বাপু। আমি যেমন শুনে-ছিলুম তেমনি বলেছি।

—শোনা-কথার উপর বেশী আস্থা স্থাপন করা উচিত নয়, তার চেয়ে কেন চল না একদিন গিয়ে তার সঙ্গে দেখা ক'রে তার হাল-চাল সব বুঝে আসবে।

—আচ্ছা সে হবে এখন, তারপর আর সব মূর্ত্তিমানদের ব্যাপারটা কি বল তো শুনি?

—আর সবের কথা ছেড়ে দাও—ওই এক প্রকাশ যা বড়লোকের ছেলে—নইলে আমরা যারা কেশবের সুসজ্জিত বৈঠকখানায় বসে নিত্য আড্ডা দেই, হরদম পান-তামাক আর চা-চুরুটের শ্রাদ্ধ করি এবং মধ্যে মধ্যে কেশবের ঘাড় ভেঙে কোনও হোটেলে কি বাগানে কিম্বা তার বাড়ীতেই 'চৌব্য চোষ্য লেহ্য পেয় ভোজনের ব্যবস্থা করি—আমাদের সকলেরই হাল-চাল সমান! অর্থাৎ সবারই সেই 'অন্ত ভক্ষ্য ধনুর্গুণঃ' অবস্থা! আমি তো তবু কেরাণীগিরি ক'রে মাসিক কিছু পাই, কিন্তু আমার সহচরেরা কেউ বিদেশীর কাছে দাসত্ব স্বীকার করতে রাজি নয় ব'লে তারা হয়েছে কেউ কবি, কেউ ঔপন্যাসিক, কেউ চিত্রকর! কেউ বা ইস্কুলে মাষ্টারী করে, কেউ বা খবরের কাগজের সম্পাদকতা করে, কারুর ছাপাখানা আছে, কেউ বইয়ের দোকান খুলেছে—এই রকম আর কি!

—অর্থাৎ ছাত্রজীবনের অভিনয় শেষ ক'রে তাঁরা কেউ বেকার বসে নেই বটে কিন্তু বেশ সচ্ছলভাবে সংসার চলতে পারে এমন আয়েরও সংস্থান কেউ ক'রতে পারেন নি, কেমন এই ত?

—হ্যাঁ, অনেকটা তাই বটে, তবে কি জানো, আটকাচ্ছে নাও কারুর কিছু; কোনও রকমে কায়-ক্লেশে ধার-কর্জ্জ ক'রে এর টুপি ওর মাথায় চড়িয়ে দিন গুজরান ক'রছে। কিন্তু তা ব'লে আমাদের প্রতি সপ্তাহে থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখা বন্ধ নেই, ছুটি ছাটা পেলে শহরের বাইরে কোথাও বেড়িয়ে আসাও চলছে। গার্ডেন পার্টি—মদের মাইফেল্—এ সবেরও কামাই নেই।

—আচ্ছা, কি ক'রে এ সব তোমাদের চলে? উদ্বৃত্ত আয় যাদের নেই, তারা এ সমস্ত অতিরিক্ত বাজে খরচ চালায় কেমন ক'রে আমি ত' কিছু বুঝতে পারছি নি। চুরি ডাকাতী করে নাকি?

বিজয় হাসতে হাসতে বললে—না, এখনও অতটা করবার প্রয়োজন হয় নি, তার কারণ, যে সব বন্ধুর অবস্থা একটু বেশী শোচনীয়—তাদের বাইরে যাবার খরচ—এই ধরো যেমন রেলভাড়া, খাওয়া প্রভৃতি, এমন কি মদ ও মেয়েমানুষের ব্যয়ও অবস্থাপন্ন বন্ধুরাই বহন করে। থিয়েটার বা বায়োস্কোপ যাবার সময় টিকিটের দাম, ট্রাম ভাড়া, ট্যাক্সীভাড়া, পান, সিগারেট, সোডা-লেমনেড, চা—কোনও কোনও দিন চপ-কাটলেট পর্য্যন্ত সব খরচ কেশবের ঘাড়ে পড়ে!

—পরের স্কন্ধে এ রকম লাট্-নবাবী করতে তোমাদের একটু লজ্জা ক'রে না! কি ক'রে মুখে ও সব রোচে?" যাদের ট্যাঁক খালি তাদের প্রাণে আবার অত সখ কেন?

বিজয়ের মুখখানা একটু ঈষৎ আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। একটু ভারি গলায় সে বললে—এ তোমার অন্যায় কথা মণিকা, সখটা হচ্ছে মনের ব্যাপার, অবস্থায় দরিদ্র হ'লেও মনটা তো সবার গরীব নয়! বড়লোকেই সৌখীন হয় বটে, কিন্তু সখের সাধটা কি তাদেরই একচেটে বলতে চাও?

—আচ্ছা, না' হয় থিয়েটার বায়োস্কোপই দেখ্‌লে, কিন্তু—

—কিন্তু কি?—মদ আর মেয়েমানুষের খরচা ব'লছো?

ওটা আবহমান কাল থেকেই বড়লোকের ছেলেদের স্কন্ধে গৃহস্থের ছেলেরা চালিয়ে আসছে, ও কিছু নূতন নয়! তা ছাড়া আমাদের দলের মধ্যে সবাই কিছু মাতাল নয়। পালা পার্ব্বনেই খায়, তবে ধরো' হঠাৎ যদি কখন খুব একটা

আনন্দজনক ব্যাপার কিছু ঘটে তা হ'লে দু'এক বোতল আসে, আবার নিদারুণ কিছু দুঃখের কারণ ঘটলেও ওরা মদের প্রয়োজন অনুভব করে। আর—আর কি জানো, যখন অসহ্য গরম পড়ে তখন একটু ঠাণ্ডা হবার জন্য বরফ দেওয়া সোডা মেশানো হুইস্কীর গেলাস তারা যেমন আগ্রহে মুখের কাছে তুলে ধরে তেমনি আগ্রহেই ডিসেম্বরের কন্‌কনে শীত এড়াবার জন্যে তারা একটু ব্রাণ্ডীর আস্বাদ নিতে উৎসুক হয়। তারপর বাদলার দিনের কথা তুমি ছেড়েই দাও। তখন এক এক দিন জলে ভিজে গিয়ে আমারই এক আধ চুমুক খেতে ইচ্ছে হয়!

—বেশ! বেশ!—তবে আর বাদ দেয় তারা কবে শুনি?

—আর, তুমিও যেমন! এমনিই একটু আধটু স্ফূর্ত্তি করে যদি বেচারাদের অভাবের নিষ্পেষণে বিধ্বস্ত জীবনের অশ্রুভারাক্রান্ত দিনগুলা কোনও রকমে কেটে যায় মন্দ কি? কদিনই বা বাঁচ্‌বে? সেই জন্য আমি আর কোনও আপত্তি করি নি। করছে করুক, দু'দিনের জন্যও জীবনটা উপভোগ করে নিক্‌।

—এই যদি তোমার অভিমত তবে তুমি কেন ও রসে বঞ্চিত হ'য়ে আছো? দলে ভিড়ে যাও!

—আমার সংস্কারে বাধে! আমি ও-গুলোকে ছেলেবেলা থেকে দোষ ব'লেই মানতে শিখেছি এবং ওর বিরুদ্ধে যে সব নিষেধাজ্ঞা আছে, তা পালনে আমি অভ্যস্ত হ'য়ে পড়েছি। তাকে লঙ্ঘন ক'রে যাবার মতো আমার যুক্তি বা সাহস কোনটাই নেই!

—তবে তুমি আমাদের ব্রত-উপবাস ধর্ম্ম-কর্ম্মের উপর এত চটা কেন? দেবদ্বিজেই বা তোমার ভক্তি নেই কেন? সে দিকে তুমি এমন খৃষ্টান হয়ে উঠ্‌লে কি করে?

বিজয় হেসে ফেলে বললে—এই দেখো তোমার আর একটা কত বড় ভুল। খৃষ্টান্‌রা তোমাদের চেয়েও বেশী ক'রে ধর্ম্মকে মানে এবং খৃষ্টান-ভক্তরা কেউ তোমাদের চেয়ে কম গোঁড়া নয়। তাদেরও ভগবানের একজাত পুত্রের প্রতি এবং প্রচারক পাদ্রীদের প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে; সুতরাং 'খৃষ্টান্‌' বল্‌লে আমাকে অতিরিক্ত সম্মান্‌ করা হয়।

মণিকা মৃদু হেসে তার তর্জ্জনী নেড়ে ও মস্তক সঞ্চালন ক'রে বল্‌লে—তা হ'লে আজ থেকে তোমাকে আমি 'নাস্তিক' বলে ডাক্‌বো—

—কেন? নাস্তিক হলুম কিসে? আমি তোমাদের ও ঘেটু ঠাকুর বা ইঁতু দেবতা মানিনি বটে, কিন্তু ঈশ্বরকে যে মানি তোমাদের চেয়েও অনেক বেশী!

—তার প্রমাণ কি? তুমি তো আমাদের তেত্রিশ কোটী দেবতাকেই গাঁজাখুরি গল্প ব'লে উড়িয়ে দাও!

—সেই জন্যেই তো ভগবানকে তোমাদের চেয়ে বেশী ক'রে আমি মানতে পারি! তেত্রিশ কোটী দেবতার ভিড়ে তিনি তোমাদের কাছ থেকে বেশ সহজে লুকিয়ে থাকেন, কিন্তু আমার কাছে একেবারে সোজাসুজি ধরা প'ড়ে যান!

এ কথাটা যেন মণিকার মনে লাগ্‌ল, একটু ভেবে বললে—ইস্‌, একেবারে কথার ভটচায্যি! মুখে মুখে জবাব লেগেই আছে!—তা' তুমি একা মানলে কি হবে? তোমার দলের কেউ মানে কি?

একটু কুণ্ঠিত হয়েই যেন বিজয় বললে—না, আমাদের দলকে দল কেউই ঈশ্বরের অস্তিত্বটা প্রকাশ্য ভাবে মানে না এটুকু বলতে পারি। আমাদের দেব-দেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরের মধ্যে স্থাপত্য কলার ও ভাস্কর্য্য শিল্পের কোনও নৈপুণ্য যদি দেখতে পাওয়া যায় তা হ'লে আমাদের দলের অনেকেই তার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সে সবের কোনটার এতটুকু দেবত্বও তারা স্বীকার করে না!

—তবে তোমরা ছুটির দিনে কখন বেলুড় মঠে, কখন দক্ষিনেশ্বরে ছোট' কেন? মাঝে মাঝে দল বেঁধে গঙ্গাস্নান করতেই বা যাও কেন?—

—ভাল লাগে বলে। গঙ্গাস্নানে বেশ আরাম বোধ করি! বেলুড়ে বা দক্ষিণেশ্বরে বেড়িয়ে এসে বেশ একটা শান্তি পাই।

—ওঃ, তা হ'লে তোমরা দেখ্‌ছি সব হিন্দু-নাস্তিক!

বিজয় আবার হেসে ফেললে। মণিকাকে খুশী হ'য়ে

একটু আদর করে বললে—হিন্দু-নাস্তিক! মন্দ নয়, কথাটা বড় লাগসই বলেছো! আমরা কোনও শাস্ত্র কোনও ধর্ম্ম কোনও আচার না মানলেও কোনও দিনই এ গুলোকে শ্রদ্ধা বা ঘৃণা করি নি। মন্দির মস্‌জিদ্, ও গির্জ্জার অস্তিত্ব আমাদের কাছে সমান নিরর্থক বলে মনে হ'লেও অপ্রীতিকর একটুও নয়।

—কিন্তু তোমাদের অক্ষয় কবির প্রেমে পড়াটা তো দেখলুম তোমার বেশ অপ্রীতিকর লেগেছিল।

বিজয় এবার একটু গম্ভীর হ'য়ে বললে—দেখো, আমাদের দলের কেউ অক্ষয়ের এই প্রেমে পড়া রোগটাকে খুব বেশী মারাত্মক বলে মনে করতো না বটে, কিন্তু আমি এটাকে কোনও দিনই সমর্থন করতে পারি নি। আমার মনে হয় যে-বিবাহিত পুরুষ তার গত যৌবনা স্ত্রীকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো অবহেলা ক'রে নিত্য নূতন প্রেমের সন্ধানে ঘোরে সে লোক শুধু অকৃতজ্ঞ নয়, পাষণ্ড। আমার বন্ধু-পত্নীরা সকলেই এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত। তারা কেউ অক্ষয়কে ছ'চক্ষে দেখতে পারে না। তার সম্বন্ধে তর্ক উঠ্‌লে বন্ধুরা তাঁদের পত্নীদের অভিমতের বিন্দুমাত্রও প্রতিবাদ করতেন না, বরং বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে বাড়ীর ভিতর বসে তাদের কথাই সমর্থন করতেন, কিন্তু তাদের নিজস্ব মত ছিল ঠিক তার বিপরীত! তারা ব'লে বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে প্রেম হওয়া অসম্ভব! এবং এ সম্বন্ধে বৈষ্ণব শাস্ত্রোক্ত পরকীয়া ও সহজিয়া প্রেমের নজিরটাকেই তারা সব চেয়ে বড় বলে ঘোষণা করে! আর সেই জন্মেই দেশের পণ্যা রমণীদের তারা একটুও ঘৃণা করে না! বরং তাদের প্রতি আমাদের দলের একটা গভীর সহানুভূতি আছে দেখতে পাই! প্রায়ই কেশবের অনুগ্রহে কিম্বা আর কারুর স্কন্ধে চেপে তারা সহরের উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্য্যন্ত সব দিকেরই গণিকা পল্লীর নব নব অধিবাসিনীদের গৃহে গিয়ে মাঝে মাঝে আতিথ্য গ্রহণ করে। রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদের বান্ধবী বলে পরিচয় দিতে তারা কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করে না!

মণিকা তার দু'ই চক্ষু বিস্ফারিত ক'রে ব'ললে—কি সর্ব্বনাশ! তুমি এই সব লোকের সঙ্গে মেলামেশা করো? এদের বন্ধু বলে পরিচয় দিতে তোমার লজ্জা করে না?

বার দু'ই মাথাটা চুলকে নিয়ে মুখটা একটু নীচু করে বিজয় বললে—কোনও কোনও জায়গায় পরিচয় দিতে লজ্জা যে করে না এমন কথা বলতে পারিনি, তবে, একটা কথা কি জানো— সেই যাকে বলে 'ঠগ বাছ্‌তে গাঁ উজোড়'—তাই আর কি! সুতরাং মেলামেশা ছেলেবেলা থেকে যাদের সঙ্গে ক'রে আসছি তাদের কি ত্যাগ করবো? আর লজ্জাই বা করব কার কাছে? আজকাল সবাই যে ওই দলের! শুধু এই আমাদের মতো অল্প জনকতক বেরসিক আছে যারা—তারা যেন এ কালে সৃষ্টি-ছাড়া!

—বল কি গো? সবাই ওই রকম?

—হ্যাঁ, তা এক রকম সবাই বই কি!

—আচ্ছা তোমরা এই যে মাঝে মাঝে দল বেঁধে বিদেশে বেড়াতে যাও তখন কি করো?

—তখনও অনুষ্ঠানের কোনও ত্রুটিই থাকে না। মদের বোতল সব সঙ্গেই থাকে, ট্রেনে পা' দিলেই সোডার ব্যবস্থা হয়। এবং যেখানেই যাই না কেন গাড়ী থেকে নেবেই বন্ধুরা সর্ব্বাগ্রে স্ত্রীলোকের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়েন!

—ছি ছি! আমি আর তোমার ও বন্ধুবান্ধবদের সামনে বেরুবো না!

—কেন মণিকা, তোমার সম্মান তো ওরা কোনও দিন ক্ষুণ্ণ করে নি! সেদিকে তো ওরা বিশিষ্ট ভদ্রলোক! তা ছাড়া আমাদের প্রত্যেকের স্ত্রীই যখন সকল বন্ধুর সামনে বেরোয় এবং কথা কয় তখন তোমার এ আচরণ যে বড় দোষের হবে। আমরা আমাদের দলের মধ্যে তো কোন পর্দ্দার বালাই রাখি নি।

—আমি ওদের সবার স্ত্রীর কাছেই তোমাদের স্বরূপ পরিচয় জানিয়ে দেবো এবং সকলকেই তোমাদের সামনে আর যেতে নিষেধ করে দেবো।

—তাতে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফলই ফলবে বলে মনে হয় মণিকা!

—কেন?

—ওরা স্ত্রীর কাছে এখনও যেটুকু সঙ্কোচের আবরণ রেখে-চলে সেটা যদি তুমি একবার ভেঙে দাও তা হ'লে তো সব একেবারে বে'পরোয়া হ'য়ে যাবে! ধরা পড়লে চোর

মরিয়া হ'য়ে ওঠে জানো না? এখন ওরা শ্রীরামপুর যাচ্ছি—বা কোন্নগর যাচ্ছি ব'লে, কিম্বা আগড়পাড়ার বাগানে নেমন্তন্ন আছে জানিয়ে বাড়ী থেকে ছুটি নেয়! কিন্তু সব জানাজানি হয়ে গেছে বুঝ্‌লে ওদের ভয় কে'টে যাবে, তখন ওই কেশবের আড্ডায় বসেই মদ চলবে হয় ত। এখন ওরা যেখানেই থাক্, রাত্রি দশটা এগারটার মধ্যেই যেমন ক'রে হোক্ ফিরে আসে, কিন্তু তখন হয় ত' তা'রা সারা রাতই আর ফিরবে না।

—তা' যা' বলেছো; সেই একটা মস্ত ভয় আছে!

—সেই জন্যই তো আমার বন্ধুবান্ধবদের স্বরূপ পরিচয় এতদিন তোমার কাছ থেকে গোপন ক'রে রেখেছিলুম। পাছে তুমি শুনে ওদের স্ত্রীর কাছে সব গল্প করো সেইটে ছিল আমার সবচেয়ে বড় আশঙ্কা।

—তবে আজ সব ব'লল কেন?

—আজ তোমার উপর আমি নির্ভর ক'রতে পারি। এখন তুমি সত্যিই বড় হয়েছো, তোমার দায়িত্বজ্ঞান হয়েছে!

—তুমি আর হাড় জ্বালিও না বাবু! দুই ছেলের মা আমি, এতদিন পরে বুঝি সাবালক হলুম?

—তুমি রাগ কোরো না মণিকা, কিন্তু সত্যিই তাই! ছেলের মা হ'লেও আমাদের দেশের অনেক মেয়েরই দায়িত্ব জ্ঞান জন্মায় না। তাদের মনের পরিণতি ঘটতে বিলম্ব হয়।

—আচ্ছা তুমি কি আমাকে সত্যিই ভালবাসো?

—হঠাৎ এ কথা জিজ্ঞাসা করবার মানে?

—তুমি যে বললে, বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা হ'তে পারে না!

—সেটা তো আমার মত বলি নি। ওরা তাই মনে করে বলিছিলুম।

—আচ্ছা, কেন ওরা তা মনে করে? এই ত' আমি তো তোমাকে খুব ভালবাসি! আমার মতন কি ওদের স্ত্রীরাও ওদের ভালবাসে না?

—তা আমি ঠিক বলতে পারি নি, তবে আমার মতো তারা যে কেউ তাদের স্ত্রীকে ভালবাসে না এ কথা ঠিক্! বল্‌তে বল্‌তে বিজয় যেন তার কথার প্রমাণস্বরূপই মণিকার অধরে একটি সানুরাগ চুম্বন এঁকে দিলে।

মণিকার সুন্দর মুখখানি একটা খুশী ও আনন্দের তৃপ্তিতে দীপ্ত হ'য়ে উঠল! সে বললে,—দেখো, আমি লক্ষ্য করিছি, কিন্তু তোমায় বলি নি এতদিন, ওদের স্ত্রীরা সত্যিই ওদের তেমন ভালবাসে না, কেমন যেন একটা ঢিলেঢালা আলগোছ ভাব! তেমন বেশ আঁতের টান একটা কারুর নেই!

বিজয় মণিকাকে আদরে আপন বাহুপাশে আবদ্ধ ক'রে বললে,—তোমার তো আমার উপর আছে, তা হ'লেই হ'ল! দুনিয়ায় আর কারুর থাক্ বা না থাক, তাতে আমার কি এসে যায়? ক্ষণকাল চুপ করে থেকে বিজয় আবার বললে, —ভালবাসা ছেলেখেলা নয় মণি, ওটা একটা দুর্লভ সম্পদ। প্রাণ দিয়ে না ভালবাসতে পারলে কি ভালবাসা পাওয়া যায়! ওটা একটা সৌখীন বিলাসের সামগ্রী নয়। ওরা যদি ওদের স্ত্রীর কাছ থেকে ভালবাসা না পেয়ে থাকে তবে সে জন্য দায়ী ওরা নিজেরা। বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসা হওয়া সম্ভব নয় বলে যারা মনে করে তাদের কাছে ওটা চিরদিন অসম্ভবই থেকে যায়—কি বলো?

—নিশ্চয়! তবে তোমাদের ওই কনক চাটুজ্জে তার স্ত্রী রেণুকে না কি একটু ভালবাসে শুনেছি!

—ক্ষেপেছো? ও মুখের ভালবাসা; স্ত্রীকে যদি সত্যই সে ভালবাসতো তা'হলে আশা বলে একটা বেশ্যার প্রেমে অমন ক'রে ডুবে থাকৃতে পারতো না।

—বলো কি? তুমি যে আমাকে অবাক্ ক'রে দিলে। অমন একজন শিক্ষিত লোক, কত উপন্যাস কত গল্পের বই লিখেছে, ও এমন নষ্ট? বেশ্যা রেখেছে?

—রেখেছে না আরও কিছু। হাতী পোষবার খরচ পাবে কোথা? সেই মাগীটাই বরং ওকে রেখেছে বলতে পারো!

—ছি ছি! গলায় দড়ী!

—তাই বটে! আমাদের মধ্যে এক দেখতে পাই, ওই হেমদাস আর তার স্ত্রী ছায়া—এদের দু'জনের মধ্যেই ঠিক্ ভালবাসা না থাক্—অন্তত একটা বন্ধুত্ব আছে বেশ!

—কিন্তু তোমাদের যে প্রধান আড্ডাধারী কেশব—সে আর তার স্ত্রী কমলা—এদের মধ্যে তো একতিলও বনিবনাও দেখতে পাই নি!

—ওরা যে দু'জনেই একেবারে দু'রকম প্রকৃতির কি না? দু'জনেই ভারী একগুঁয়ে—জেদী—সেদিক দিয়ে ধরতে গেলে তোমার অক্ষয় কবির স্ত্রী—আমাদের বৌদি—একেবারে আদর্শ পত্নী! স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখন চলেন না! একেবারে নিতান্তই পতিব্রতা! অক্ষয়ের সমস্ত অনাচার তিনি মুখ টিপে সহ্য করেন।

—আর ক্ষিতীশবাবুর স্ত্রীটি মারা গিয়ে বড্ড রক্ষে পেয়েছেন কি বলো?

—সে আর—একবার ক'রে ব'লতে? আমার মনে হয় পাগলার গান গাওয়ার উৎপাতে অতিষ্ঠ হ'য়ে ভদ্রমহিলা প্রাণত্যাগ করেছেন! ক্ষিতীশ যে আর বিয়ে করে নি এইটেই সে একটা মস্ত বড় সুবিবেচনার কাজ করেছে!

—আর তোমাদের ঐ প্রিয়ধনটা কি বিশ্রী কেলেঙ্কারী করলে বল তো?—

—যাক্ গে, সে কথা আর তুলো না; ওর কথা মনে হ'লে আমার এমন রাগ হয়!

—আচ্ছা তোমাদের দলের সেই কারা জয়পুরে বায়স্কোপের ছবি তুলতে গেছ্‌ল—তারা ফিরেছে?

—হ্যাঁ, আধমরা হ'য়ে ফিরেছে। সেখানে ভয়ানক ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হ'চ্ছে, টপাটপ সব লোক ম'রছে! ওরা বড্ড প্রাণে বেঁচে গেছে!

—ওদের বায়স্কোপের ছবিটা কবে দেখানো হবে? আমায় সে দিন নিয়ে যেও কিন্তু!

—সে ছবির দফা রফা হ'য়ে গেছে! সেখানে ওরা সব কে জানে কী কাণ্ড করেছিল। জয়পুরের মহারাজ ওদের ছবিখানি কেড়ে নিয়ে বাজেয়াপ্ত ক'রেছে!

—বেশ করেছে! আপদ বালাই ঘুচেছে। তোমাদের সেই আইবুড়ো বন্ধু প্রকাশ না সেখানে ছিল শুনেছিলুম! তার কি খবর? ইনফ্লুয়েঞ্জা ধরে নি তো?

—না, সে তার অনেক আগেই চলে এসেছিল। তার বাপ গিয়ে তাকে ধরে এনেছিল।

—ওর একটা তোমরা ধরে বেঁধে বিয়ে দিয়ে দাও না! বলো তো আমি ঘটকালী করি! আমার সন্ধানে বেশ একটি সুন্দরী মেয়ে আছে, গান বাজনা লেখাপড়া শিল্পকর্ম্ম সংসারের কাজ সব জানে, দিব্যি মেয়ে! বয়সও হ'য়েছে, ওর সঙ্গে সাজবে ভালো—

—ও যে বিয়ে করবে না বলে একেবারে ভীষ্মের পণ করেছে। নইলে বাংলা দেশে কি আর মেয়ের অভাব আছে; বিশেষ প্রকাশ যখন অমন সুপাত্র!

—ওর বিধবা বোন্ উমা যে একজন মস্ত বড় সাহিত্যিক হ'য়ে উঠেছে! প্রায়ই কাগজে পত্রে তার লেখা দেখতে পাই!

—কেমন লেখে?

—ছাই। বিধবা মানুষের অত প্রেমের কবিতা লেখা কেন? গল্পগুলোতেও সব হতাশ প্রেমিকের ছবি!

—এ যে তোমাদের অন্যায় কথা মণি, বেচারী বিধবা বলে কি সাহিত্যেও সে আতপ চাল আর কাঁচকলা সিদ্ধ ছাড়া আর কিছু লিখতে পাবে না!

—জানি নি বাবু! চলো খাবে চলো, রাত হ'য়েছে।

—মা কি করছেন?

—তাঁর আজ একাদশী, তিনি সকাল সকাল শুয়ে পড়েছেন।

—আজকে ছেলেদের এ ঘরে এনে শোয়ালে হ'তো, রাত্রে উঠে মাকে বিরক্ত করবে হয়ত।

—তা' আমি কি ক'রবো বলো? আমি ত' তাই বলিছিলুম, কিন্তু নাতী দু'টিকে দু'পাশে না নিয়ে শুলে মা'র ঘুম হবে না, আর ছেলেগুলোও ঠাকুরমার কাছে না হ'লে শোবে না!

—তা ভাল'। চল' খেয়ে নিই গে— ক্রমশ—